যিয়ারাতুল কুবূর

বা

কবর যিয়ারত

লেখকঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ)

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ وَالاِسْتِنْجَادُ بِالْمَقْبُوْرِ

যিয়ারাতুল কুবূর

বা

কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

মূল ঃ
ইমামুল আনাম মুজাদ্দিদে 'আযম শাইখুল ইসলাম
তাকীউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়্যাহ
(রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

অনুবাদ ঃ
মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

যিয়ারাতুল কুবূর
বা
কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ইমামুল আনাম, মুজাদ্দিদ 'আযম শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) খিদমতে নিম্নলিখিত মাসআলায় ফতোয়া চাওয়া হয়।

প্রশ্নাবলী

১। কতক লোক মাযারে গিয়ে নিজেদের কিছু অর্থ অথবা ঘোড়া, উট (গরু, বকরী) প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু নযর স্বরূপ পেশ করে রোগ নিবারণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। কবরের অধিবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলে ঃ ইয়া সাইয়েদী। হে আমার পীর মুর্শেদ! আপনি আমার মদদগার-আমার সাহায্যকারী। অমুক ব্যক্তি আমার উপর যুল্‌ম করেছে, অমুক ব্যক্তি আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়ে চলছে। সে এই বিশ্বাস রাখে যে, কবরের বাসিন্দা তার এবং আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী।

২। কতক লোক মাসজিদ এবং খানকাসমূহে যিন্দা অথবা মৃত পীরের নামে নগদ টাকা পয়সা, উট (গরু), বকরী এবং (আলোর জন্য) বাতি, তেল, (মোম) প্রভৃতি নযর মান্নৎ করে আর সেখানে গিয়ে বলে, যদি আমার রুগ্ন ছেলে বেঁচে উঠে তাহলে পীরের নামে অমুক অমুক বস্তু দেয়া আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৩। কতক লোক নিজেদের শেখ অথবা পীরের নিকট নিজের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ জানায় এবং দরখাস্ত পেশ করে বলে, আমি অমুক বিপদে গ্রেফতার হয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বেগে কাল কাটাচ্ছি।

৪। কতক লোক নিজেদের পীর মুর্শেদের মাযারে চুমা দেয়, তাতে নিজেদের কপাল ও গাল-মুখ ঘষায়, আর কবরে হাত ঘষে নিয়ে মুখমণ্ডলে বুলিয়ে নেয়, এছাড়া এ ধরনের আরও বহু অপকর্ম করে।

৫। কতক লোক নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা ওলী আউলিয়াকে লক্ষ্য করে বলে পীরজী কেবলা! আপনার বরকতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক অথবা এই কথা বলে ঃ আল্লাহ এবং মুর্শিদের বরকতে আমার আরযু পুরা হোক!

৬। কতক লোক মাহফিল মাজলিসের আয়োজন করে এবং কবরের কাছে গিয়ে স্বীয় মুরশীদের সম্মুখে মাটিতে সিজদায় পড়ে যায়।

৭। কতক লোক কুতুব, গাউস, আবদাল প্রভৃতির প্রতি আস্থা রাখে, তারা মনে করে যে, কতক কতক জায়গায় এরূপ বুজুর্গ ব্যক্তি অবস্থান করেন (আর তার ফলেই দুনিয়া কায়েম রয়েছে. নইলে কবেই তা ধ্বংস হয়ে যেতো)।

এই ধরনের খেয়ালাত এবং আকীদাহ সম্পর্কে পূর্ণ আলোকপাত করে কুরআন ও হাদীস মুতাবেক বিস্তারিত ফতওয়া প্রদানে মর্জি হয়।

জওয়াব

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যাঁর অপার অনুগ্রহে আসমানী কিতাব সমূহের অবতরণ সম্ভব হয়েছে এবং নাবী রসূলগণের উত্থান ঘটেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ নাবী রসূলদেরকে কেন প্রেরণ করেছেন? কেন কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন?

উত্তর ঃ এ কাজ তিনি শুধু এজন্যই করেছেন যেন পৃথিবীতে সেই একক আল্লাহ, যাঁর কোন শরীক নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত হয়, একমাত্র তিনিই পূজিত হন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বরণ করা হয়, একমাত্র তাঁরই কাছে সর্ব ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয় এবং একমাত্র তাঁরই উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করা হয়

আর কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একমাত্র তাঁকেই ডাকা হয়। যেমন আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (زمر : ١-٣)

"এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজ্ঞা বিভূষিত আল্লাহ্‌র নিকট হতে! (হে নাবী মোস্তফা!)" প্রকৃত প্রস্তাবে– যথার্থভাবে এই কিতাব আপনার প্রতি আমিই নাযিল করেছি। সুতরাং আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে যান, তাঁরই দাসত্ব পুরোপুরি বরণ করে নিন, দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশে খালেস করে নিয়ে হুশিয়ার হয়ে যান, (মনে রাখবেন) খালেস দ্বীন তথা নিষ্কলুষ হৃদয়ের নিবেদন নির্ভেজাল ধর্মকর্মই গৃহীত হয় আল্লাহ্‌র কাছে। আর (এ কথাও জেনে রাখুন) যে সব লোক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অপর কাউকে ওলী অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে (এবং নিজেদের সেই কর্মের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে বলে,) আমরা তো তাদের পূজা করি না, তবে তাদের শরণাপন্ন হই শুধু এজন্য যে, তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেবে।" যে বিষয়ে তারা মতভেদ মতান্তর ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে আল্লাহ তাদের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন। (সূরা যুমার ১-৩)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (جن : ١٨)

২। (রসূলুল্লাহ ﷺ কে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে আপনি আরও জানিয়ে দিন যে,) সিজদার স্থান সমূহ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সুনির্দিষ্ট (আর সিজদা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য), অতএব (তোমরা একমাত্র তাঁকেই ডাকবে) আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকেই ডাকবে না। (সূরা জ্বিন ১৮)

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (اعراف : ۲۹)

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে, আমার প্রভু পরোয়ার্দিগার আমাকে ইনসাফ করার হুকুম দিচ্ছেন এবং প্রত্যেক সিজদার সময়ে (প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে) তাঁরই দিকে তোমাদের চেহারা, তোমাদের সমগ্র সত্তাকে একাগ্র করবে এবং তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করে (তাঁরই আনুগত্য পূর্ণভাবে বজায় রেখে) তাঁকে আহবান জানাবে। (সূরা আল-আরাফ ২৯)

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (بنی اسرائیل : ٥٦ -٥٧)

(হে রসূল!) আপনি ঐ সমস্ত মুশরিকগণকে বলে দিন যে, আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা (বিপদের কাণ্ডারী রূপে) ধারণা করে নিয়েছ তাদেরকে ডেকে দেখ, (তাহলে দেখতে পাবে যে,) তারা তোমাদের উপর থেকে কোন বিপদই দূর করতে পারে না, (এমনকি সেই বিপদের) একটু খানি পরিবর্তনও ঘটাতে পারে না। যাদেরকে তারা ডেকে থাকে তারা তো নিজেরাই তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের 'ওসীলা' খুঁজে বেড়ায় যে, কোনটি নিকটতর। আর তারা আযাবের ভয়ও পোষণ করে চলে, নিশ্চয় আপনার প্রভুর আযাব হচ্ছে আশংকার বিষয়। (সূরা বনী ইসরাঈল ৫৬ ও ৫৭)

সলফে সালিহীনের (ইসলামের প্রথম যুগের বুযুর্গ ব্যক্তিদের) মধ্যে এক দল বলেছেন যে, কতক লোক ঈসা ('আ.), উযায়র এবং ফেরেশতাদেরকে বিপদ-আপদ দূর করার জন্য আহ্বান জানাতেন। তাদের আহ্বান যে ব্যর্থ বিড়ম্বনা তা বুঝিয়ে দেবার জন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা যাদের আহ্বান জানাচ্ছ তারাও তো তোমাদের মত আমারই বান্দা। তোমাদেরই মত তারাও আমার রহমাতের প্রত্যাশী এবং আমার শাস্তির ভয়ে ভীত। আর আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তোমরা যেমন অভিলাষী তারাও সে জন্য তেমনি অভিলাষী।

সুতরাং নাবী এবং ফেরেশতাদের আহ্বানকারীদেরই যখন এই অবস্থা, তখন ঐ সমস্ত লোক তো উল্লেখযোগ্য এবং বিবেচ্য হতেই পারে না যারা এমন সব লোকদেরকে আহবান জানায় যারা কোন দিক দিয়েই নাবী এবং ফেরেশতাদের সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ (كهف : ١٠٢)

কাফিররা কি এই আক্বীদাহ (দৃঢ় মূল) করে নিয়েছে যে আমাকে ছাড়া আমার বান্দাদেরকে নিজেদের ওলী-অভিভাবক বানিয়ে নিতে পারে? (অথচ এ জন্য তাদের কোন সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে না) বস্তুতঃ আমি কাফিরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। (সূরা কাহাফ ১০২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (السبا : ٢٢-٢٣)

আপনি (হে রসূল!) মুশরিকদের বলে দিন ঃ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অভাব দূরকারী ও বিপত্রাণ মনে করে থাক, তাদের ডাক দিয়ে দেখ, দেখতে পাবে যে তারা আসমান এবং যমীনে অণু পরিমাণ ক্ষমতাও রাখে না, আল্লাহ্র সঙ্গে এই ব্যাপারে তারা কোন শরীকও নয়, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্র সহায়তাকারীও নয়। আর আল্লাহ্র নিকট কোন শাফাআতই কাজে আসবে না কিন্তু সেই ব্যক্তির শাফাআত ছাড়া আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন। (সূরা সাবা ২২)

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে কোন সৃষ্ট বস্তু, এমন কি ফেরেশ্তা এবং নাবী রসূলদের মধ্যেও যাদেরকে আহবান জানান হয় তাদের মধ্যে কারোরই আল্লাহ্র আসমান-যমীনের বাদশাহীতে অণু-পরমাণু বরাবর

কোন শক্তি নেই। তার সার্বভৌম রাজত্বে কেউ কোন শরীক বা অংশীদারও নেই। বরং একমাত্র সেই শাশ্বত সত্য-চিরন্তন আল্লাহ্ই কারোর কোন অংশীদারত্ব ছাড়াই সার্বভৌম ও সর্বশক্তিধর অধিপতি, সর্ব বস্তুর উপর তাঁরই অপ্রতিহত ক্ষমতা বিরাজমান, ব্যবস্থাপনার মাঝেও তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, কারো কোনরূপ সহায়তার তিনি মোটেই মুখাপেক্ষী নন। বাদশাদের রাজত্ব পরিচালনা এবং শাসন ও বিচারের ব্যবস্থাপনায় যেমন সাহায্যকারী ও সহযোগীর প্রয়োজন হয় আল্লাহ্র বেলায় তা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনেরও সাধ্য কারও নেই।

এভাবে এর দ্বারা শির্কের যত রকম প্রকরণ থাকতে পারে সমস্তই নিষিদ্ধ ও রহিত হয়ে যাচ্ছে।

শির্ক সম্পর্কে চার প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা এবং তার রদ

চারটি উপায়ে শির্কের ন্যায় গুরুতর পাপাচার ঘটতে পারে। প্রথম- আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য যাকেই ডাকা হবে, তার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করা হবে যে, সে মালিক অর্থাৎ তার কিছু করার পূর্ণ অধিকার আছে; দ্বিতীয়- সে মালিক নয়, তবে মালিকিয়্যতে শরীক আছে, সুতরাং কিছু করার আংশিক অধিকার রয়েছে; তৃতীয়ত- সে পূর্ণ অথবা আংশিক মালিক নয়, তবে সহায়তাকারী, চতুর্থত- তিনটির একটিও নয়, তার ভূমিকা হচ্ছে প্রার্থনাকারীর, যাচ্ঞাকারীর।

এ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকরণের শির্কের নিষিদ্ধতা সন্দেহতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারণ এক আল্লাহ ছাড়া কেউ পূর্ণ মালিক নন, মালিকুল মুল্ক তিনিই, সার্বভৌম অধিকার একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট, তাঁর সার্বভৌম অধিকারেও কারও শরীকানা বা অংশ নেই, তাঁর কার্যে সহায়তাকারী ও সহযোগীও কেউ নেই। বাকী রইল চতুর্থ প্রকরণের শির্ক অর্থাৎ তাঁর নিকট সুপারিশের উদ্দেশে কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করা, কিছু যাচ্ঞা করা। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া এই সুপারিশ এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন সম্ভব নয়, সিদ্ধও নয়। কারণ সুপারিশের চাবিকাঠি তাঁরই হস্তে ন্যস্ত। নিম্নোধৃত আয়াতসমূহ পাঠ করলেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে ঃ

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (بقرة : ٢٥٥)

১। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর বিনা হুকুমে সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে? (সূরা আল-বাকারাহ ২৫৫)

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم : ٢٦)

২। আসমানে কতই না ফেরেশতা রয়েছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমতি এবং সম্মতি মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারও জন্য তাদের সুপারিশ কিছুমাত্রও উপকারে আসবে না (বস্তুতঃ তাঁরা অনুমতি ও সম্মতি ব্যতিরেকে সুপারিশই জানাতে সক্ষম হবে না)। (সূরা আন নাজম ২৬)

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (زمر : ٤٣-٤٤)

৩। তারা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়া অপর কতককে সুপারিশকারী ধরে নিয়েছে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন ঃ যে অবস্থায় কোন কিছুর উপর তাদের কোন অধিকার না থাকে এবং যদিও তাদের বিবেক বুদ্ধি বলে কিছু না থাকে সে অবস্থাতেও তোমরা তাদেরকে তোমাদের শাফাআতকারী তথা কল্যাণ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস রাখবে? বলে দিন ঃ সকল প্রকারের সমস্ত শাফাআত সুফারিশের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, আসমান এবং যমীনের রাজত্ব একমাত্র তারই অধিকারভুক্ত, অতঃপর তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে তাঁরই সকাশে। (সূরা আয্-যুমার ৪৩ ও ৪৪)

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (السجده : ٤)

আল্লাহ তো তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এর মাঝে কিছু আছে সমস্তই ছয় দিনে সৃজন করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর আসন গ্রহণ করেছেন, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন ওলী অভিভাবকও নেই- কোন

সুপারিশকারীও নেই। এরপরেও কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে না? এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা আস-সিজ্‌দা ৪)

﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (النعام ٥١)

৫। (হে রসূল!) আপনি কুরআনের মাধ্যমে ঐ সব লোকদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকুন যারা এই কথায় ভয় রাখে যে, ক্বিয়ামাত দিবসে তাদেরকে স্বীয় প্রভুর সামনে সমাবিষ্ট করা হবে এমন অবস্থায় যে, তাদের সাহায্য করার জন্য না থাকবে কোন ওলী-অভিভাবক, না থাকবে কোন সুপারিশকারী; হয়ত এই ভয় প্রদর্শনের ফলে তারা হয়ে যাবে সংযমশীল-পরহেযগার। (সূরা আল-আন'আম ৫১)

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (ال عمران : ٧٩-٨٠)

৬। কোন মানুষের পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তাকে প্রদান করেন আসমানী কিতাব, (ত্রুটিমুক্ত ও ধীরস্থির) জ্ঞান বুদ্ধি এবং পয়গম্বরী, অতঃপর সে লোকদের বলে ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমারই বান্দা হয়ে যাও।" বরং (যে ব্যক্তি এই মহা অবদান লাভ করবে) সে তো বলবে তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্‌ওয়ালা, কেননা তোমরা অপর লোকদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব পড়িয়ে থাক এবং নিজেরাও পড়ে থাক। আর সে তোমাদেরকে কখনই এ কথা বলবে না যে, ফেরেশতা এবং পয়গম্বরদেরকে রব তথা প্রভু বলে স্বীকার করে নাও। তোমরা মুসলিম হওয়ার পরেও কি সে তোমাদেরকে (এরূপ) কুফরী করতে বলতে পারে? (সূরা আলু ইমরান ৭৮-৮০)

এই শেষোক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে, যারা ফেরেশতা এবং নাবী রসূলদেরকে রব বা প্রভু রূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে কুরআন মাজীদে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ঐরূপ গ্রহণ করার কাজকে কুফরী বলা হয়েছে। নাবী ও

ফেরেশতাদেরকে যারা রব ভাবে তাদের সম্বন্ধেই যখন এরূপ কঠোর ব্যবস্থা ও হুশিয়ারী, তখন ওলী আউলিয়া, শেখ মাশায়েখদের যারা প্রভুর আসনে বসায় তাদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। (তারা কাফির না হয়ে যায় কোথায়?)

আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নিকট কিছু চাওয়ার ব্যাখ্যা

তা কয়েক প্রকার হতে পারে, যেমন ঃ

১। যে বস্তু চাওয়া হয় বা যে বিষয়ে প্রার্থনা জানানো হয় তার প্রকরণ যদি এমন হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পক্ষেই তা পূরণ করা সম্ভব নয়- তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট ঐরূপ চাওয়া বা প্রার্থনা জানানো কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। তা হবে সুস্পষ্ট শির্কের পর্যায়ভক্ত। বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হচ্ছে।

রুগ্ন ব্যক্তি অথবা ব্যাধিগ্রস্ত চতুস্পদ জন্তুর রোগমুক্তির আবেদন, অজানিত উপায়ে ঋণমুক্তির প্রার্থনা, বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, শত্রুকে পরাভূত করার জন্য সাহায্য কামনা, নফ্‌সের হিদায়াত, অপরাধের মার্জনা, পাপের স্খালন এবং বেহেশত লাভের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন, দোযখের আগুনের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা, ইল্‌ম ও কুরআনের শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের বিশোধন, আত্মার শুদ্ধি, চরিত্রের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকটেই দরখাস্ত পেশ করা জায়িয নয়। এ কাজ কোন প্রকারে কোন ওজুহাতেই সিদ্ধ নয়। কোন ফেরেশতা. কোন নাবী, কোন ওলী, কোন শাইখ, কোন পীর-জীবিত হোক অথবা মৃত, কারোর নিকট এ কথা বলা চলবে না যে, আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন, আমার পরিবার পরিজনকে সুস্থ রাখুন ও নিরাপত্তা দান করুন, আমার অমুক জানোয়ারটিকে রোগ মুক্ত করুন- এই ধরনের অথবা এরূপ যে কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেনে রাখা উচিত, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কারো নিকট এরূপ প্রার্থনা জানায় তাহলে সে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে বসে। ফেরেশতা বা নাবীদের পূজা করা, মূর্তি পূজা করা, ঈসা ('আ.) এবং তার মা মারঈয়াম ('আ.)-এর পূজা করা, আলিম উলামা, ওলী আউলিয়া, শাইখ মাশায়েখ প্রভৃতিকে আল্লাহর স্থলে রব বানিয়ে নেয়া সবই একই শির্কের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে নিম্নোধৃত আয়াতগুলো লক্ষ্যযোগ্য ঃ

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ

مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (المائدة : ١١٦)

১। এবং যখন [ঈসা ('আ.)-কে লক্ষ্য করে] আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ঈসা ইবনে মারঈয়াম! তুমি কি লোকদেরকে এই কথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া আমাকে এবং আমার মাকে অতিরিক্ত উপাস্য প্রভুরূপে গ্রহণ কর-দুই মা'বুদ বলে মেনে নাও? (সূরা আল-মায়িদাহ ১১৬)

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا

إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (توبه : ٣١)

২। ঐ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া তাদের আলিম-উলামা ও পীর-দরবেশ, যাজক মোহন্তদেরকে আর মারঈয়ামের পুত্র ঈসাকে (অতিরিক্ত) প্রভু-পরোয়ারদিগার বানিয়ে নিয়েছে অথচ প্রকৃত কথা এই যে, তাদেরকে শুধু এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, এক ও একক মা'বুদেরই ইবাদাত করে চলবে (অন্য আর কাউকে আরাধ্য-উপাস্য ধরবে না)। তিনি অর্থাৎ সেই একক প্রভু পরোয়ারদিগার ছাড়া অন্য কোন উপাস্য প্রভু নেই; তিনি তাদের শির্ক থেকে মুক্ত পাক পবিত্র। (সূরা আত-তাওবাহ্ ৩১)

দ্বিতীয়তঃ এমন কোন বিষয় বা বস্তু যদি চাওয়া হয় যার উপর মানুষের কিছু ক্ষমতা রয়েছে, তা হলে সেই অবস্থায় উক্ত বিষয় বস্তু চাওয়া জায়িয আছে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এই ধরনের চাওয়া থেকেও বিরত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾ (الم نشرح : ٨)

"(হে রসূল!) যখন আপনি উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা থেকে কিছুটা মুক্ত হবেন অথবা আপনাকে সত্য প্রচারের যে বিরাট দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার থেকে যখন কিছুটা ফারেগ হবেন, তখন আপনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার প্রভু পরোয়ার্দিগারের প্রতি সমগ্র হৃদয় মন দিয়ে ঝুঁকে পড়বেন, একমাত্র তাঁরই দিকে একাগ্রচিত্ত হবেন।"(সূরা ইনশিরাহ ৭ ও ৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে ওসীয়ত করেছেন এভাবে ঃ

(২) اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله.

২। তোমাকে যদি কিছু চাইতেই হয়, তাহলে চাইবে একমাত্র আল্লাহ্রই নিকটে, আর যদি কারোর সাহায্য কামনা করতে হয় তাহলে সাহায্য কামনা করবে একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই, অপর কারো নিকট নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীদের মধ্যে একদল অর্থাৎ অনেককে এই নসীহাত করেছেন ঃ কোন মানুষের নিকটেই কোন সওয়াল করবে না। যার ফলে তারা তাদের সমগ্র জীবনে কোন ব্যক্তির নিকটেই কিছু চান নাই- এমনকি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহীদের মধ্যে কারোর হাত থেকে চাবুক নিচে পড়ে গেলেও কাউকে বলতেন না যে, আমার পড়ে-যাওয়া চাবুকটা তুলে দাও, বরং তিনি স্বয়ং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তা তুলে নিতেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(৩) يدخل الجنة من امتى سبعون الفابغير حساب، وهم الدين لايستوقون ولايكتون ولايتطيرون وعلى ربهم يتوكلون-

৩। "আমার উম্মাতের মধ্যে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে- তাদের আলামত হচ্ছে এই যে, তারা ঝাড়-ফুঁক করে না, দাগ দেয় না এবং শুভ-অশুভ সময় ক্ষণের সংস্কার মানে না, তারা সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরেই নির্ভর করে।" (ইসতিসকার অর্থ ঝাড়-ফুঁক কামনা করা এবং তা হচ্ছে এক প্রকার দু'আ)

এ সত্ত্বেও আবার রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন রিওয়ায়াতও এসেছে যাতে বলা হয়েছে,

مامن رجل يدعوله اخوه بظهر الغيب دعوة الا وكل الله بهما ملكا كلما دعى لا خيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك-

"যে ব্যক্তি তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে তথায় নিয়োজিত রাখেন। যখনই সে

তার ভাই এর জন্য দু'আ করে তখনই সেই ফেরেশতা বলেন, "আপনার জন্য ঐরূপ হোক।"

তিনি আরও বলেছেন, "অনুপস্থিত এক ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত অন্য ব্যক্তির দু'আ গৃহীত হয়ে থাকে।"

এই ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতকে তাঁর প্রতি দরূদ এবং তাঁর জন্য ওয়াসিলা কামনা করতে হুকুম প্রদান করেছেন; যারা এরূপ করবে তাদের জন্য তিনি প্রভূত পুরস্কারের শুভ সংবাদ শুনিয়েছেন। হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اذا سمعتم المؤذن فقو لوا مثل مَاَ يقولُ ثم صلوا على فان من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم اسآلوا الله لى الوسلة فانها درجة فى الجنة - لا ينبغى ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكن ذالك العبد - فمن سال الله لى الوسبلة حلت له شفاعتى يوم القيامة.

"যখন মুয়ায্যিন আযান উচ্চারণ করতে থাকে তখনি মুয়ায্যিন যা বলে তোমরা তাই বলে চলবে, তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশ বার দরূদ (শান্তি) পাঠান, তারপর ঐ আযানের শ্রোতারা আমার জন্য ওয়াসীলা কামনা করবে আর ওয়াসীলা হচ্ছে বেহেশতের একটি সুউচ্চ ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ স্থান। তা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একটি মাত্র বান্দাই লাভ করবে, আমি আশা রাখি যে, আমিই হব সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য সেই ওয়াসীলার প্রার্থনা জানাবে, ক্বিয়ামাত দিবসে সিদ্ধ হয়ে যাবে তার জন্য আমার শাফা'আত অর্থাৎ সে হবে আমার শাফা'আত লাভের হকদার।"

নিজের চাইতে ছোট এবং নিজের চাইতে বড় উভয়ের প্রতি দু'আর আবেদন জানান শরীয়তে সিদ্ধ। যেমন আমরা দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ ﷺ উমরার দিবসে বিদায় তাওয়াফের সময় ওমার (রাযি.) কে বলেছেন,

لا تنسنا من دعائك يا اخى.

"ভ্রাতঃ! তোমার দু'আয় আমাদের ভুলে যেও না, অর্থাৎ আমার কথাও স্মরণ রেখো।"

অবশ্য এর ভিতরে আমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এর এরশাদ যে, আমার প্রতি দরূদ পড় এবং আমার জন্য ওয়াসিলা চাও এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলা যে, আমার প্রতি একবার যে দরূদ পাঠ করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দশবার শান্তি প্রেরণ করেন এবং তিনি এই বলেন যে, যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসিলা চাইবে সে আমার শাফাআত লাভের হকদার হয়ে যাবে-এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই চাওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেদের কল্যাণের জন্যই চাওয়া। আর এই দুই চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য অর্থাৎ অন্য কারো জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া আর নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

১। সহীহ বুখারীতে আছে, উয়াইস কারণী (রহ.)-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ 'উমার (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

ان استطعت ان يستغفرلك فافعل.

"যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমার নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আয়ে মাগফিরাত করাবে।"

২। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আবূ বাক্র (রাযি.) এবং উমার (রাযি.)-এর মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মতবিরোধ এবং তর্কবিতর্ক হয়ে যায়। আবূ বাক্র অবশেষে বলেন, আমার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করুন! অবশ্য অন্য রিওয়ায়াতে এ কথাও এসেছে যে, উক্ত ব্যাপারে আবূ বাক্র (রাযি.) 'উমার (রাযি.)-এর প্রতি নারায (অসন্তুষ্ট) হয়ে যান।

৩। এ কথা প্রমাণ সিদ্ধ যে, কতক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ কে দু'আ পড়ে তাদেরকে ঝাড়ফুঁক করতে বলতেন এবং তিনি তাদের (অনুরোধ রক্ষার্থে) ঝাড়ফুঁক করতেন।

৪। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ কথাও পাওয়া যায় যে, অনাবৃষ্টির জন্য (মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশে) রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইসতিস্কার অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের দু'আর আবেদন জানানো হয়। ফলে তিনি দু'আ করেন এবং বর্ষণ হয়।

৫। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পর 'উমার (রাযি.) আব্বাস (রাযি.)-এর ইমামতিতে ইসতিস্কার নামায পড়েন। এই উপলক্ষে তিনি আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন,

اللهم انا كنا اذا اجد بنا نتوسل بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبيانا فاسقنا، فسقوا–

"প্রভু হে! রসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় আমরা নাবী ﷺ কে ওয়াসীলা ধরে পানি বর্ষণের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাতাম, ফলে আমাদের জন্য তুমি পানি বর্ষণ করতে, এখন আমরা তোমার রসূল ﷺ এর চাচাকে ওয়াসীলা ধরে দু'আ করছি, তুমি আমাদের প্রতি রহমাতের পানি বর্ষণ কর।" ফলে পানি বর্ষিত হয়েছে।

৬। একবার এক বেদুঈন জান ও মালের ক্ষয় ক্ষতি এবং পরিবার পরিজনের অনাহার এবং অন্যান্য বিপদাপদের অভিযোগ করে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে আরয করলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের জন্য দু'আ করুন; তারপর বললো-

فانانستشفع بالله عليك وبك على الله–

"আমরা আপনার কাছে আল্লাহ তা'লাকে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপিত করছি আর আল্লাহ্র কাছে আপনাকে সুপারিশকারী রূপে পেশ করছি।"

বেদুঈনের মুখে এ কথা শুনার পর রসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি একক আল্লাহ্র মহত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে বেদুঈনকে বললেন,

ويحد، ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه شان الله اعظم من ذالك–

"আল্লাহ তোমার ভাল করুন। আল্লাহ তা'আলাকে তার কোন সৃষ্ট জীবের কাছে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে না, আল্লাহ্র শান–আল্লাহ্র মর্যাদা এর অনেক অনেক উর্ধ্বে।"

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আল্লাহ্কে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপনকে রসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে নাকচ করে দিলেন

এবং তা সিদ্ধ নয় বলে সাব্যস্ত করলেন, কেননা এটা আল্লাহ্র মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশকারীরূপে পেশ করার কাজকে বহাল রাখলেন এবং সিদ্ধ বলে মেনে নিলেন। এর কারণ এই যে, বান্দা তার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানায় এবং সুপারিশ মঞ্জুর করার যিনি কর্তা সুপারিশকারী তাঁর নিকট সুপারিশ জ্ঞাপন করে। প্রভু পরোয়ারদিগার কখনও বান্দার নিকট কিছু সওয়াল করেন না, তার কাছে সুপারিশও করেন না, করতে পারেন না।

শরীআত মুতাবেক এবং সুন্নাত অনুসারে কবর সমূহের যিয়ারত

কবর যিয়ারতের সুন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি এই যে, যিয়ারতকারী কবরের বাসিন্দার প্রতি সালাম জানাবে এবং তার জন্য ঠিক সেভাবে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে যেভাবে জানাযার জন্য দু'আ পড়া হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এরূপ শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যখন কবরসমূহ যিয়ারত করবে তখন এই কথাগুলো বলবে,

السلام عليكم ياأهل ديار من المومنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون – يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، لسال الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم–

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকূন। ইয়ার হামুল্লাহুল মুস্তাকদেমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখেরীন, নাস্ আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফীয়াতা, আল্লাহুম্মা লাতাহ্রিমনা দআজরাহুম ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহুম।

"হে মুমিন ও মুসলিমদের বস্তির (অর্থাৎ কবরের) অধিবাসীবৃন্দ! আপনাদের প্রতি সালাম (আল্লাহ্র তরফ থেকে আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!) আমরা ইনশা আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের প্রতি এবং পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ রহমাত করুন।

আমরা আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির প্রার্থনা জানাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করো না এবং তাদের পর আমাদেরকে বিপদাপদে নিক্ষেপ করো না।"

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام-

"যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যার বাসিন্দা দুনিয়ায় ছিল তার নিকট পরিচিত, তাকে সে সালাম জানালে আল্লাহ তা'আলা তার রুহকে তার দিকে ফিরিয়ে দেন ফলে সে উক্ত সালামের জওয়াব প্রদান করে।"

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তির দু'আর সওয়াব ঠিক সেরূপ, যেরূপ তার জানাযা পড়ার সওয়াব। এজন্যই মুনাফিকদের জন্য দু'আ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ﴾ (توبه ٨٤)

"তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে কেউ মারা গেলে তাদের জন্য কখনো (রহমাতের) দু'আ করবে না; আর তাদের কবরের কাছে গিয়েও দাঁড়াবে না।"
(সূরা আত-তাওবাহ ৮৪)

মৃত ব্যক্তির নিকট জীবিত ব্যক্তির কোন প্রয়োজন মিটানোর আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করতে এবং তাকে ওয়াসীলারূপে পেশ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি।

বরং জীবিত ব্যক্তিকে হুকুম করা হয়েছে ঃ সে যেন মৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে চেষ্টা চালায়, তার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করে, তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ প্রার্থনা করে। কেননা (মুমিন) মৃত ব্যক্তির জন্য (মুমিন) জীবিত ব্যক্তির দু'আ একদিকে যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য রহমাত নাযিলের কারণ হয়, তেমনি সেই ব্যক্তিও সওয়াব ও পুরস্কারের হকদার হয়ে যায়।

সহীহ্ বুখারীতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعوله-

"মৃত্যুর পর মানুষের আমলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকারের আমল ব্যতীত।"

১। সদাকায়ে জারীয়া।

২। তার রেখে যাওয়া ইল্ম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়।

৩। সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।"

কবরের কাছে গিয়ে হাজত চাওয়ার তিন প্রকরণ

কোন ব্যক্তি যখন কোন নাবী অথবা ওলীর মাযারে গমন করে অথবা এমন কবরের কাছে গমন করে যে কবর সম্বন্ধে তার ধারণা যে, উক্ত কবর কোন নাবী, ওলী অথবা সালেহ্ বান্দার কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা সত্য নয় আর সে ঐ মাযার বা কল্পিত মাযারে গিয়ে কবরের (সত্য অথবা মিথ্যা) বাসিন্দার নিকট তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে সব প্রার্থনা জ্ঞাপন করে সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১। কবরের বাসিন্দার নিকট প্রার্থনা জানান ঃ যেমন নিজের জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা, ঋণ শোধ, দুশমনের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে তার নিকট এমন প্রার্থনা জানান যা পূরা করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই নেই, থাকতে পারে না। এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন হবে পরিষ্কার (সন্দেহাতীত) শির্ক। এরূপ শির্কে যে ব্যক্তি লিপ্ত হবে তাকে অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে। তাওবাহ না করলে তা হবে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

যদি সে তার কৃতকর্মের সপক্ষে এই দলীল এবং যুক্তি পেশ করে যে, উক্ত কবরের বাসিন্দা আল্লাহ্র নৈকট্যে আমাদের অপেক্ষা অধিক অগ্রবর্তী, তিনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবেন কবর পূজারীরা বলে, আমরা মৃত ব্যক্তির ওয়াসীলা ঠিক সেভাবেই ধরি বা কামনা করি যেরূপ বাদশাকে ধরবার জন্য তার নিকটতম ব্যক্তি এবং পারিষদকে ধরার প্রয়োজন ঘটে যেন তারা

বাদশার নিকট সুপারিশ করে প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে পারে। তাদের এই ধরনের বক্তব্য এবং মুশরিক নাসারাদের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাদেরও আকীদা এই যে, তাদের পুরোহিত পাদ্রী এবং তাদের ঋষি মনীষী ও সাধু সন্ন্যাসীরা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সুপারিশ জানিয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ মুশরিকদের এই বিশ্বাস এবং যুক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যেমন তারা বলে থাকে ঃ

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر : ٣)

"আমরা তাদের ইবাদাত শুধু এ জন্যই করে থাকি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌছিয়ে দেবে।" (সূরা আয-যুমার ৩)

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزمر : ٤٣-٤٤)

"তারা কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজেদের সুপারিশকারীরূপে নির্বাচন করে নিয়েছে? (আপনি হে রসূল !) বলে দিন ঃ যদিও কোন বস্তুর উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব না থাকে এবং তাদের বুঝবার মত ক্ষমতাও না থাকে (তবু সেই অবস্থাতেও তাদেরকে তোমরা সুপারিশকারীরূপে আঁকড়ে ধরে থাকবে)"? (হে রসূল) আপনি ঘোষণা করে দিন ঃ সমস্ত শাফাআতের ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে, যাঁর হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং যাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে সকলকে।" (সূরা আয-যুমার ৪৩ ও ৪৪)

مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (السجده : ٤)

"(হে লোক সকল!) তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তোমাদের জন্য না আছে কোন ওলী-অভিভাবক আর না আছে কোন সুপারিশকারী। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা আস সাজদা ৪)

"কে আছে এমন যে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে?' (সূরা আল-বাকারা ২৫৫)

উপরে উধৃত আয়াতগুলোতে খালেক ও মাখলূক-স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

মানুষ বাদশাহ বা কোন বড় হাকিমের নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনের জন্য তার এমন খাস কোন সুহৃদ বা নৈকট্যে অবস্থানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে নেয় যার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেন বা করতে বাধ্য হন কতিপয় কারণে। হয়ত সুপারিশকারী রূপে নির্বাচিত ব্যক্তি বাদশাহ হাকিমের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, তার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন, কিংবা তার ভয়ের পাত্র তার ভিতরে এক অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব আছে কিংবা তার প্রভাব প্রতিপত্তি এমন যে, বাদশাহ তাকে সমীহ না করে পারে না, কিংবা বাদশার সঙ্গে তার সম্পর্কটি এমন যে, তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতে তিনি লজ্জা এবং সংকোচবোধ করেন, অথবা সম্পর্কটি ভালবাসা এবং স্নেহের সঙ্গে জড়িত কিংবা এমনি ধরনের অপর কোন সম্পর্ক যার কারণে তাঁর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবও নয়, সহজও নয়, বরং তাতে ক্ষতির আশঙ্কাই বিদ্যমান। কিন্তু মহা প্রভু আল্লাহ এ সমস্ত বাধ্যবাধকতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক পবিত্র। কেউ তার নিকট সুপারিশের সাহসই সঞ্চয় করতে পারবে না যে পর্যন্ত তিনি স্বয়ং কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি না দেবেন। আর সেই অবস্থাতেও সে শুধু ঐ পরিমাণ সুপারিশ জ্ঞাপন করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ মর্জি ফরমাবেন, আর সে সুপারিশটিও হবে তার সম্পূর্ণ অনুমতি সাপেক্ষ। কাজেই এই আলোচনা থেকে এই ফল পাওয়া গেল যে, সমুদয় ইখতিয়ার সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই হস্তে ন্যস্ত। এজন্যই বুখারী-মুসলিমের এক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন ঃ

لا يقولن احدكم اللهم اغفرلى ان شئت اللهم ارحمنى ان شئت ولكن ليعزم المسئلة فان الله لا مكره له.

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার প্রার্থনায় এরূপ না বলে ঃ প্রভু হে! আমাকে মাফ করে দাও যদি তুমি চাও, আমার প্রতি তুমি রহম কর যদি তুমি ইচ্ছা কর, বরং সওয়ালে অর্থাৎ প্রার্থিত বিষয়ের কামনায় দৃঢ়-সংকল্প হতে

হবে-কেননা আল্লাহ্‌কে কেউ বাধ্য করতে পারে না" (কিন্তু তার নিকট অন্তরের পূর্ণ দৃঢ়তায় প্রার্থনা করা যেতে পারে)।

এই হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আকে বাধ্য করতে পারে না-যেমন পার্থিব জগতে রাজা বাদশাহ ও হাকিম প্রভৃতিকে সুপারিশকারী তার সুপারিশ গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম হয় অথবা প্রার্থনাকারী দুনিয়ার কোন কর্তা ব্যক্তির নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ ও বহু কাকুতি মিনতির পর তার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে রাজী করাতে সক্ষম হয় এবং এভাবে প্রার্থী তার উদ্দেশ্য হাসিল করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার ব্যাপারে একটি মাত্র দুয়ারই উন্মুক্ত আর তা হচ্ছে এই যে, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা কামনা, অনুরাগ আসক্তি একমাত্র প্রভু পরোয়ারদিগারের দিকেই [illegible]বিত হবে ঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝ (انشراح : ٧-٨)

"যখন তুমি (তোমার জরুরী কাজ থেকে) ফারেগ হবে বা অব্যাহতি লাভ করবে তখন তুমি (তোমার প্রভুর সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক উন্নততর করার জন্য) মেহনত করে চল এবং স্বীয় প্রভুর দিকে অনুরাগ সম্পন্ন হও-তোমার সমস্ত মনোযোগ মনোনিবেশ তাঁরই দিকে একনিষ্ঠ করে নাও। (সূরা ইনশিরাহ ৭-৮)

আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয় ও ভীতিও মনে জাগরূক রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ (بقرة : ٤٠)

"এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।" (সূরা আল-বাকারাহ ৪০)

কারণ কোন মানুষ নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভয়ের পাত্র, যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾ (المائدة : ٤٤)

"লোকদের ভয় মনে স্থান দিও না, ভয় কর একমাত্র আমাকেই।"
(সূরা আল-মায়িদাহ ৪৪)

রসূল ﷺ আমাদেরকে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁকে আমাদের দু'আ কবূলের যারীআ বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ পথভ্রষ্ট লোক কবরের কোন কোন বাসিন্দা (নাবী, ওলী, আওলিয়া পীর দরবেশ) সম্বন্ধে এই আকীদা পোষণ করে থাকেন যে, (কবরে শায়িত) এই বুযুর্গ আল্লাহ্‌র নৈকট্যে অবস্থানকারী আর আমরা রয়েছি তার থেকে অনেক দূরে, কাজেই তারই মধ্যস্থতায় আমরা আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত পেশ করে থাকি। তারা এ ধরনের আরও অনেক বাজে কথা বলে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সমস্তই হচ্ছে মুশরিকদের উপযোগী কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তো কুরআন মজীদে তার সম্বন্ধে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন ঃ

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (البقرة : ١٨٦)

"আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন (হে রসূল! আপনি তাদের বলে দিন যে,) আমি তাদের নিকটেই রয়েছি-এত নিকটে যে, যখন কেউ আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৬)

এই আয়াতের শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা সহাবাগণ রসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে আরয করলেন, আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগার যদি নিকটেই থাকেন, তাহলে তো মনে মনে প্রার্থনা জানানোই যথেষ্ট আর যদি তিনি দূরে অবস্থান করেন তাহলে বুলন্দ আওয়াজে তাকে ডাকা প্রয়োজন। এরই জওয়াবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

বুখারীতে রিওয়ায়াত এসেছে যে, (রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ভ্রমণরত) সহাবাগণ এক সফরে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ শুনে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধির এবং অনুপস্থিত কোন সত্তাকে আহবান জানাচ্ছ না।

بل تدعون سميعا قريبا اقرب اليكم او الى احدكم من عنق راحلته.

"বরং তোমরা এমন একজনকে ডাকছো যিনি সব কিছুই শুনতে পান এবং যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন-এত নিকটে যে তিনি তোমাদের নিজেদের চাইতেও নিকটতর অথবা তিনি বলেছিলেন, তিনি তোমাদের সওয়ারীর গরদান অপেক্ষাও নিকটতর।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে তাঁর উদ্দেশে নামায পড়ার এবং তাঁর নিকট মুনাজাত করার হুকুম দিয়েছেন, এছাড়া তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে নামাযে এবং নামাযের বাইরেও নির্দেশ দিয়েছেন এই কথা বলেতে ঃ

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة : ٥)

"আমরা (হে প্রভু পরোয়ার্দিগার!)"একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকি।" (সূরা ফাতিহা ৫)

এটা হচ্ছে প্রকৃত মুওয়াহ্হিদ তথা খাঁটি তাওহীদবাদীর কথা। আর মুশরিকদের-তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে কৈফিয়ত হচ্ছে ঃ

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر : ٣)

"আমরা তো তাদের পূজা এজন্য এবং এই আশা নিয়েই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে নিয়ে যাবে।" (সূরা যুমার ৩) অর্থাৎ তাদের সাহায্য সহায়তায় এবং সুপারিশে আমরা নৈকট্য লাভে সক্ষম হবো।

এখন আমরা ঐ মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা যে ঐ কবরের বাসিন্দাকে ডেকে থাক, আচ্ছা বল দেখি, তোমাদের ধারণায় কবরের ঐ বাসিন্দা কি আল্লাহ্র চাইতে বেশি জ্ঞান রাখে? অথবা তোমাদের চাহিদা মিটাতে সে কি আল্লাহ্র অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা রাখে? কিংবা সে কি আল্লাহ্র চাইতে তোমাদের প্রতি বেশী মেহেরবান? যদি এটাই তোমাদের আকীদা হয়ে থাকে, তবে তা নিরেট মূর্খতা, স্পষ্ট গুমরাহী এবং পরিষ্কার কুফর। আর যদি তোমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন তোমাদের সম্বন্ধে অন্য সবার চাইতে বেশী ওয়াকেফহাল, তোমাদের অভাব অভিযোগ, চাহিদা প্রয়োজন, কামনা বাসনা পূরণ করার অধিকতর ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা মেহেরবান, তাহলে তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ডাকার এবং অন্যের নিকট প্রার্থনা

জ্ঞাপন করার কি কারণ থাকতে পারে? এখনও কি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই হাদীসটি তোমাদের কানে যায়নি যা ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য হাদীস সংকলকগণ তাদের স্ব স্ব হাদীস গ্রন্থে সহাবী জাবির (রাযি.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন? তাতে বলা হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে যেরূপ কুরআন মাজীদের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে ইস্তিখারার দু'আ শিক্ষা দিতেন। এই দু'আ শিক্ষাদানকালে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন সংকটে নিপতিত হয় এবং দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, তখন সে যেন (ইশার) ফরয নামায (এবং সুন্নাত, বিতর) ছাড়াও আরও দু' রাক'আত (অতিরিক্ত নামায) আদায় করে এই দু'আ পাঠ করে ঃ

«اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ، فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِىْ عَاجِلِ أَمْرِىْ وَآجِلِهِ . فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার (গায়িবী) ইল্‌ম থেকে কল্যাণ কামনা করি, তোমার কুদরত হতে শক্তি যাচ্ঞা করি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ লাভের আমি অভিলাষী–কেননা তুমিই কুদরতের অধিকারী, শক্তিবান, আমার কোন ক্ষমতা নেই-শক্তিহীন আমি, আর একমাত্র তুমিই জান (কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ)। আমি কিছুই জানি না, তুমি অদৃশ্য বিষয়ে অত্যধিক জ্ঞানবান, যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজ (কাজটির কথা মনে মনে ধ্যান করতে হবে) আমার জন্য কল্যাণকর, আমার দ্বীন-ধর্মের জন্য শুভ, আমার জীবিকার জন্য মঙ্গলকর এবং আমার সমুদয় কাজের পরিণামে কল্যাণবহ হয়, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও, তা আমার জন্য সহজ সাধ্য করে দাও তারপর তাতে

তুমি বরকত প্রদান কর। আর তোমার জ্ঞানে এই কাজ যদি আমার দ্বীন-ধর্ম, আমার জীবিকায় এবং আমার কাজের পরিণতিতে অশুভ ও ক্ষতিকর হয়, তাহলে এই কাজকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নাও, আর আমাকেও ঐ কাজ থেকে দূরে অপসৃত করে দাও। অতঃপর আমার জন্য যা শুভ ও কল্যাণবহ তাই নির্ধারিত করে দাও এবং তাতেই আমার হৃদয়ে সন্তোষ প্রদান কর।"

এই দু'আ পাঠ করে নিজের আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা জানাবে। এই দু'আয় আল্লাহ্র নিকট মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, কারণ তিনিই সর্বজ্ঞাতা (সর্বকাজের ভাল মন্দ একমাত্র তিনিই জানেন)। তিনি শ্রেষ্ঠতম শক্তিধর। যা কিছু চাওয়ার তাঁরই নিকট চাইতে বলা হয়েছে-অন্য কারোর নিকটেই নয়, কারণ তিনিই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী, তিনিই যে মহা অনুগ্রহপরায়ণ।

কবরের অধিবাসী (নাবী ওলী) এর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের দুই প্রকরণ ঃ

কবরের অধিবাসীর (তিনি নাবী হোক অথবা ওলী) নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন দুই প্রকার হতে পারে।

প্রথম প্রকরণ ঃ

যদি তুমি কবরের অধিবাসীর নিকট এজন্য কিছু প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করে থাক যে, তোমার ধারণায় তিনি তোমার চাইতে আল্লাহ্র অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী এবং আল্লাহ্র নিকট তার পদ-মর্যাদা তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ, তাহলে হয়তো কথাটা একদিক দিয়ে সত্য, কিন্তু সেটা এমন এক সত্য যার থেকে তুমি একটা ভুল অর্থ বুঝে নিয়েছো-একটা ভ্রান্ত ধারণা মনে মনে পোষণ করে চলেছে। কেননা যদি তিনি তোমার চাইতে আল্লাহ্র কাছে অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং উচ্চতর মর্যাদার হকদার হন, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তাকে তোমার চাইতে বেশী নিয়ামত দ্বারা অনুগৃহীত করবেন এবং তোমার চাইতে উচ্চতর মর্যাদা তাকে প্রদান করবেন। তার অর্থ এটা নয় যে, যখন তুমি মৃত বুযুর্গকে ডাকবে তখন সেই ডাকের

কারণে আল্লাহ তোমার সরাসরি ডাকের চাইতে বেশী করে এবং সুন্দরতররূপে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। (অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য হলে তোমার সরাসরি ডাকেই তা মঞ্জুর হবে আর মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য না হলে মৃত কোন বুযুর্গের মাধ্যমে তা পেশ করলেও মঞ্জুর হবে না)।

কেননা যে পাপাচারের কারণে তুমি হবে আযাব লাভের হকদার অথবা যখন তোমার প্রার্থনার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় গুনাহের উপর এবং সে কারণে তা প্রত্যাখ্যানের যোগ্য বিবেচিত হবে তখন সে অবস্থায় নাবীগণ এবং সালিহীন কিছুতেই তোমার সহায়তায় এগিয়ে আসবেন না- আসতে পারেন না। কারণ আল্লাহ্র নিকট যে বস্তু বা বিষয় অপ্রীতিকর এবং হারাম তেমন বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করার জন্য রাখা কর্তব্য যে, তোমার সরাসরি প্রার্থনাই কবুল হওয়ার যোগ্য, কেননা আল্লাহ্র পবিত্র সত্তাই সব চাইতে বেশী দয়াশীল এবং সর্বাধিক করুণাময়।

দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ

যদি তুমি এই ধারণা পোষণ করে থাক যে, আমি এক গুনাহগার বান্দা, আমার সরাসরি দু'আ অপেক্ষা কবরের বুযুর্গ অধিবাসী যখন আমার জন্য দু'আ করবেন সেই দু'আ আল্লাহ অতি দ্রুত এবং উত্তমরূপে কবুল করবেন-কবরে শায়িত নাবী অথবা ওলীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকরণ। এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য অবশ্য এই যে, তুমি তার নিকট কিছু প্রার্থনা জানাও না আর তার প্রতি আহবানও জানাও না বরং তার নিকট তুমি এই আবেদন জানাও যে, তিনি যেন তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন, যেমন জীবিত মানুষের নিকট বলা হয়ে থাকে- "আমার জন্য দু'আ করুন" সহাবাগণ যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করার দরখাস্ত পেশ করতেন। জেনে রাখা প্রয়োজন, জীবিত লোকদের নিকট এ ধরনের আবেদন জ্ঞাপন তো সিদ্ধ এবং শরীয়ত-সম্মত, যা উপরে পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু নাবী রসূল, পীর ওলী প্রমুখ সালিহীন-যারা এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যে, আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন অথবা আমার জন্য প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট কিছু প্রার্থনা জানান-মোটেই

সিদ্ধ নয়। সহাবা এবং তাবিয়ীন থেকেও এরূপ করার কোন প্রমাণ সাব্যস্ত নয়। আয়িম্মাদের মধ্যে কোন ইমামই এরূপ করাকে জায়িয বলেননি, আর তার সিদ্ধতার স্বপক্ষেও কোন একটা হাদীসও দেখতে পাওয়া যায় না।

বরং এর বিপরীত বুখারীতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার ফারূক (রাযি.)-এর খিলাফতকালে যখন অনাবৃষ্টির জন্য লোকের দুঃখ কষ্টের অভিযোগ উত্থাপিত হলো, তখন 'উমার (রাযি.) আব্বাস (রাযি.)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ জানালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন ঃ

اللهم انا كنا اذا اجد بنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا-

"হে আল্লাহ! নাবী ﷺ এর জীবতকালে কখনও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, আমাদের নাবী ﷺ কে তোমার নিকট ওয়াসীলা স্বরূপ পেশ করতাম, ফলে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হত ঃ এখন (তিনি ইন্তিকাল করায়) তাঁর চাচাকে ওয়াসীলা করে অর্থাৎ মধ্যস্থ বানিয়ে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছি, হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

'উমার (রাযি.) (কিংবা সহাবীদের মধ্যে অন্য কেউই) রসূলুল্লাহ ﷺ এর কবরের কাছে গিয়ে এ কথা বলেননি- 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন' অথবা এ কথাও বলেননি- 'হে নাবী ﷺ! বারি বর্ষণের আবেদন জ্ঞাপন করুন' অথবা তিনি এ কথাও বলেননি, অনাবৃষ্টির ফলে যে দুর্ভিক্ষ এবং বিপদ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আমরা তার অভিযোগ আপনার নিকট নিয়ে এসেছি কিংবা এ ধরনের অন্য কোন কথা কোন একজন সহাবাও কস্মিনকালে বলেননি এবং এসবই হচ্ছে বিদ্‌আ'ত নব আবিষ্কৃত প্রথা যার সমর্থনে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌য় কোনই দলীল নেই।

সহাবায়ে কেরামের (রাযি.) দস্তুর শুধু এই টুকুই ছিল যে, যখন তারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর রওযা মোবারাক যিয়ারত করতে যেতেন তখন তাঁরা তার প্রতি সালাম জানাতেন। যখন দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাযারের দিকে মুখ করতেন না, বরং সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহুর নিকট প্রার্থনা জানাতেন ঠিক

যেমন অন্যত্র অবস্থান কালে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে তারা অভ্যস্ত ছিলেন। এর প্রমাণের জন্য পেশ করা যেতে পারে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিম্নোক্ত কয়েকটি হাদীস ঃ

১। মুওয়াত্তা এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেছেন ঃ

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياءهم مساجد–

"প্রভু হে! আমার কবরকে সাজদাহ্র স্থানে পরিণত হতে দিওনা, সেই কওমের উপর আল্লাহর ভয়াবহ গযব নাযিল হয়েছে যারা নিজেদের নাবীদের কবরগুলোকে সাজদাহ্র স্থানে পরিণত করছে।"

لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلواتكم تبلغنى–

"(হে আমার উম্মাতের লোক সকল!) তোমরা আমার কবরস্থানকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না, তোমরা (তৎপরিবর্তে) যেখানেই অবস্থান কর না কেন, আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছানো হবে।"

বুখারীতে এসেছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء هم مساجد يحذر ما فعلوا–

"ইয়াহুদী এবং নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নাত বর্ষিত হোক! তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে সাজদাহ্র স্থান বানিয়ে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবাদেরকে তাদের ঐ অপকর্মের পরিণতির কথা বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।"

'আয়িশাহ (রাযি.) বলেন, এরূপ হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত না হলে রসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর উন্মুক্ত রাখা হতো, তাঁর কবরকে সাজদাহ্র স্থানে পরিণত করাকে তিনি পছন্দ করেননি।

সহীহ মুসলিমে রিওয়ায়াত এসেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মহাপ্রয়াণের ৫ দিন পূর্বে বলেছেন ঃ

ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذو ها مساجد، فانى اذهاكم عن ذلك.

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা কবরসমূহকে সাজদাহ্‌র স্থান বানিয়ে নিত, খবরদার! তোমরা কখনো এরূপ করো না। আমি তোমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে যাচ্ছি।"

সুনানে আবূ দাউদে আছে– রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج.

আল্লাহ লা'নাত করেছেন-

১। কবর যিয়ারতকারী নারীদের উপর,

২। তাতে মাসজিদ নির্মাণকারীদের উপর এবং

৩। তাতে বাতি প্রজ্জ্বলনকারীর (আলোক সজ্জাকারীদের) উপর।

এসব কারণেই আমাদের আলিম ওলামা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ জায়িয রাখেন নাই। তাদের নিকট কবর মাযারের উদ্দেশে নযর নিয়ায মানৎ করা, তার খাদিমকে নগদ অর্থ, তৈল, বাতি, মোম, পশু (গরু-বকরী, হাঁস-মুরগী) প্রভৃতি মানৎ অথবা নযর নিয়াযরূপে প্রদান করা কোন ক্রমেই জায়িয নয়। এই ধরনের সর্ববিধ মানৎ ও নযর নিয়ায গুনাহের মধ্যে শামিল।

কেউ নাজায়িয কাজে নযর মানলে তা পুরা না করণ

সহীহ বুখারীতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই এরশাদ রয়েছে ঃ

من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه.

"আল্লাহ্‌র আনুগত্য বরণে তথা তাঁর হুকুম মানার উদ্দেশে যে ব্যক্তি কোন নযর-মানৎ করে, তা অবশ্যই পুরা করবে, কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যাচরণে তথা তার নিষিদ্ধ কাজে নযর মানলে তা পুরা করা চলবে না।"

নিষিদ্ধ কাজে নযর মানৎ করলে তা কুফরের পর্যায়ে পড়বে কিনা সে সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলেও আয়েম্মায়ে সলফের (পূর্ববর্তী

যুগের ইমামদের) মধ্যে কোন একজনও কবরের পার্শ্বে অথবা তার চত্বরে কিংবা তার দরগাহে নামায পড়ার অধিক ফযীলত কিংবা তার মুস্তাহাব হওয়ার কায়েল (প্রবক্তা) নন। তাদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেননি যে, অন্য সব স্থান অপেক্ষা মাযারের পার্শ্বে নামায পড়া অথবা দু'আ করা উত্তম, বরং আয়িম্মায়ে সলফের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কবরের পার্শ্বে-সে কবর নাবী রসূল ও ওলী আউলিয়ারই হোক না কেন, নামায পড়া অপেক্ষা মাসজিদে এবং গৃহে নামায পড়া অধিক উত্তম।

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ মাসজিদ সম্পর্কে অনেক স্থলে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু মাযার তথা সাধারণ্যে প্রচলিত দরগাহ প্রভৃতি সম্পর্ক তাঁরা কিছুই বলেননি। এতদসম্পর্কীয় কয়েকটি আয়াত নিম্নে (অনুবাদসহ) উধৃত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة : ١١٤)

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম আর কে আছে যে ব্যক্তি মাসজিদসমূহে আল্লাহ্র নাম যিক্র করার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তার বিরাণ হওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়।" (সূরা আল-বাকারাহ ১১৪)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة : ١٨٧)

"তোমরা মাসজিদগুলিতে যে অবস্থায় ই'তিকাফে থাকবে (সে অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করবে না)।" (সূরা আল-বাকারাহ ১৮৭)

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف : ٢٩)

"হে রসূল ﷺ! আপনি বলে দিন, আমার প্রভু পরোয়ার্দিগার যে হুকুমই জারী করেছেন, তার সমস্তই ন্যায়সঙ্গত আর তিনি হুকুম করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক মাসজিদে (নামাযের প্রাক্কালে) তোমাদের মুখমণ্ডল সোজা করে নাও।" (সূরা আরাফ ২৯)

তিনি আরও বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة : ١٨)

"আল্লাহ তা'আলার মাসজিদগুলোকে আবাদ করে থাকে তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর এবং আখিরাত সম্পর্কে প্রত্যয় রাখে।"

(সূরা আত্‌-তাওবাহ ১৮)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن : ١٨)

"আর মাসজিদগুলো হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌রই (যিক্‌রের) জন্য, সুতরাং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরা জ্বিন ১৮)

এগুলোর কোনটিতেই, অথবা অন্য কোথাও আল্লাহ মাসজিদের সঙ্গে মাযার দরগার কোনই উল্লেখ করেননি।

আর রসূল ﷺ বলেছেন,

(١) صلوة الرجل فى المسجد تفضل على صلوته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة–

(১) "কোন ব্যক্তির স্বীয় গৃহে অথবা বাজারে নামায পড়ার চাইতে মাসজিদে নামায পড়ার সওয়াব ২৫ গুণ বেশী।"

(٢) من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة–

(২) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাসজিদ তৈরী করে, তার জন্য আল্লাহ বেহেশতে (আলিশান) গৃহ নির্মাণ করে রাখেন।"

অপর পক্ষে মাযার দরগাহ্ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

তাকে মাসজিদ বানিয়ে নিওনা-সাজদার স্থানে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি কবরকে সাজদাহ্‌র স্থান অথবা মাসজিদ বানিয়ে নেয়, তার উপর তিনি লা'নাত করেছেন।

বহু সহাবা এবং তাবিয়ীন এই প্রসঙ্গে নিম্নোধৃত আয়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (نوح ٢٣)

"নূহ ('আ.)-এর কওমের লোকেরা (তাদের স্বজাতিকে আরও বলেছে, সাবধান!) তোমরা নিজেদের কোনও উপাস্য ঈশ্বরকে কোন মতেই বর্জন করবে না, বিশেষতঃ "ওয়াদ, সোওয়াআ এবং য়াগূস, য়াউক ও নাসার-এই পঞ্চ দেবতাকে।" (সূরা নূহ ২৩)

নূহ ('আ.)-এর কওমের শির্ক এবং তার উৎসমূল

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে, তাবারানী প্রমুখ স্ব স্ব তাফসীরে এবং ওয়াসীমা 'ক সাসে আমবীয়া' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন যে, উপরে যে সব নাম উল্লেখ করা হল সেগুলো নূহ ('আ.)-এর কওমের কতিপয় সৎকর্মশীল ধর্মপরায়ণ বুযুর্গ ব্যক্তির নাম। তাদের ইন্তিকালের পর জনসাধারণ তাদের কবরে বসতে শুরু করল, তাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ এবং আশা করে চলল, তারপর তাদের চিত্র আঁকল এবং অবশেষে তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা শুরু করে দিল! বস্তুতঃ কবরের নিকট অবস্থান করা (তার খিদমতে নিয়োজিত থাকা), তাতে হাত রেখে সেই হাত চুম্বন করা, কবরকে সরাসরি চুম্বন করা এবং তার কাছে গিয়ে দু'আ করা অথবা এই ধরনের অন্য কিছু করা সমস্তই হচ্ছে শির্ক এবং বুৎপরস্তী তথা মূর্তি পূজার মূল শিকড়। (সেই শিকড় থেকেই শির্করূপ মহীরুহের প্রবৃদ্ধি ও প্রসার ঘটে থাকে।)

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যাতে করে তাঁর উম্মত শির্কের মহাপাতকে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.

"হে আল্লাহ! আমার কবরকে প্রতীকে রূপান্তরিত করো না যার পূজা করা হয়।" সমস্ত আলিম-উলামা এই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর রওযা মোবারকে অথবা নবী-রসূল, সালিহীন সহাবা অথবা আহলে বায়তের কবরগুলোর কোনটিকেই স্পর্শ করা এবং চুমা দেয়া জায়িয নয়। এমনকি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হাজরে আসওয়াদ অর্থাৎ কা'বা শরীফের এক কোণে সুরক্ষিত কৃষ্ণ প্রস্তর ছাড়া অন্য কোন জড় পদার্থকেই চুম্বন করা জায়িয নয়।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে হাজ্রে আসওয়াদ সম্পর্কে 'উমার (রাযি.)-এর বচন বর্ণিত হয়েছে ঃ

انی لا علم انکی حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا انی رایت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم یقبلکی ما قبلتکی.

"হে কৃষ্ণ প্রস্তর! প্রভুর কসম! আমি জানি, তুমি নিছক একটা প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছু নও, কোন অকল্যাণ অথবা কল্যাণ সাধনের কোন ক্ষমতাই তোমার নাই। রসূলুল্লাহ ﷺ কে তোমার চুম্বন দিতে যদি আমি না দেখতাম, তবে আমি কিছুতেই তোমায় চুম্বন করতাম না।"

এজন্য সমস্ত আয়িম্মায়ে-দ্বীন এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, বাইতুল্লাহ্র হাতিমের দিকে অবস্থিত দুই রুকনে, কা'বা শরীফের চারি দেওয়ালে, মাকামে ইব্রাহীমের এবং বাইতুল মাকদিসের গম্বুজে আর নাবী রসূল ও বুযুর্গদের কবরে চুম্বন দেয়া কিংবা তাতে হাত বুলিয়ে সেই হাত চুম্বন খাওয়া (কা'বার পবিত্র গিলাফে চুম্বন খাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না) সমস্তই সুন্নাতের বরখেলাফ। এমনকি রসূলুল্লাহ ﷺ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর ফযীলাতের বিবেচনায় তাঁর মিম্বারকে হস্ত দ্বারা (বারকাত লাভের উদ্দেশে) স্পর্শ করা জায়িয কিনা সে সম্পর্কে ওলামায়ে দ্বীন মতভেদ করেছেন। এরূপ অবস্থায় কবর সম্বন্ধে তো প্রশ্নই উঠে না, উঠতে পারে না।

ইমাম মালিক (রহ.) এবং তার সম মতাবলম্বীগণ এটাকে মাকরূহ বলেন, কেননা এ কাজ বিদ'আত। বলা হয়েছে, ইমাম মালিক যখন আতা (রহ.)-কে এরূপ করতে দেখলেন তখন থেকে তার নিকট হতে আর কোন হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং তার সমর্থকবৃন্দ তা জায়িয বলেছেন। কেননা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযি.) এরূপ করেছেন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর স্পর্শ করা এবং চুম্বন করাকে সকলেই ঐকমত্যে মাকরূহ বলেছেন এবং ঐরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ শির্কের মূলোচ্ছেদ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কিরূপ প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

কোন বুযুর্গ লোকের জীবিতকাল এবং মৃত্যুর পর তার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য

রসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা অন্য কোন সালেহ বান্দা অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে তাদের জীবিতাবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে বলা এবং তাদের মৃত্যুর পর অথবা অনুপস্থিতিকালে তাদেরকে ডেকে দু'আ করতে বলার মধ্যে যে পার্থক্য তা অতিশয় সুস্পষ্ট। কেননা তাদের জীবিতকালে তাদের সামনে কেউ তাদের পূজা করতে পারে না, কেউ কোন শির্কী কাজ করতে সক্ষম হয় না। কারণ নাবী রসূলগণ এবং আল্লাহর সালেহ (বুযুর্গ) বান্দাগণ তাদের সম্মুখে কাউকে কখনো কোন শির্কী কাজ করার অনুমতি দেন না। কেউ ভুলক্রমে করতে ধরলে তারা বাধা প্রদান করেন এবং করে ফেললে রীতিমত শাস্তি প্রদান করে। এখানে কুরআন মাজীদ থেকে কয়েকটি ঘটনা আমাদের দাবীর সমর্থনে পেশ করা হচ্ছেঃ

আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে যখন ঈসা ('আ.)-কে তার উম্মাতের (খৃষ্টানদের) পদস্খলন সম্পর্কে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন, "তুমিই কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাতাকে অপর দুই উপাস্য প্রভু রূপে গ্রহণ কর?" তখন তার জওয়াবে অন্যান্য কথা বলার পর ঈসা বললেন,

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

(المائدة : ١١٧)

(প্রভু হে!) তুমি আমাকে যা বলতে আদেশ করেছিলে তা ছাড়া অন্য কিছুই আমি তাদেরকে বলি নাই। (আমি বলেছি যে,) আমার প্রভু-পরোয়ারদিগার এবং তোমাদের সকলের প্রভু-পরোয়ারদিগার যে আল্লাহ, তোমরা সকলে ইবাদাত করবে একমাত্র তাঁরই, আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম ততদিনই কেবল আমি তাদের পরিদর্শক ছিলাম কিন্তু যখন আমাকে তুমি উঠিয়ে আনলে তখন থেকে একমাত্র তুমিই তো ছিলে তাদের নেগাহবান-পর্যবেক্ষক, বস্তুতঃ তুমিই তো সকল বিষয়ে সম্যক্ ওয়াকেফহাল। (সূরা আল-মায়িদাহ ১১৭)

যখন রসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি বললো,

ما شاء الله وشئت–

"যা আল্লাহর মরযী এবং আপনার মরযী।" তখন সঙ্গে সঙ্গে রসূল ﷺ তাকে বললেন,

اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده–

"কী! তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়ে দিলে? বরং বল-যা কিছু আল্লাহ্ এককভাবে চান।"

এরূপ কখনো বলবে না- ما شاء الله وشاء محمد–

যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ চান! তবে এতটুকু বলতে পার ما شاء الله ثم شاء محمد– যা আল্লাহ্‌র মরযী এবং তারপর (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে) যা মুহাম্মাদ ﷺ এর মরযী।" যখন একজন কৃতদাসী বলেছিল,

"আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন আল্লাহ্‌র রসূল যিনি কাল কী ঘটবে তা জানেন" তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, এ রকম কথা বলো না, বরং قولي بالذى كنت تقولين– তুমি আগে যা বলছিলে তাই শুধু বল। শেষের কথাটি অর্থাৎ রসূল ﷺ আগামীকাল কী ঘটবে তা জানেন এই কথা খবরদার বলো না!

রসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছে,

لا تطروني كما تطرت النصارع ابن مريم، انما انا عبد– فقولوا عبد الله ورسوله–

খৃষ্টানরা যেরূপ মারঈয়ামের পুত্র [ঈসা ('আঃ)]-কে বাড়িয়ে (তাকে আল্লাহর পুত্রের আসনে সমাসীন করে) উর্ধ্বে তুলেছে তোমরা সাবধান! আমাকে ঐরূপ বাড়িয়ো না। মনে রেখো! আমি বান্দাহ! কাজেই তোমরা বলবে আব্‌দুহু ওয়া রসূলুহু আমি (প্রথমে) আল্লাহ্‌র দাস ও (তারপর) আল্লাহ্‌র রসূল।

একদিন যখন সহাবীগণ নামায পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছেন (আর তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন) তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

لا تعظمو نى كما تعظم الا عاجم بعضهم بعضا-

আমার প্রতি তোমরা ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করো না, যেরূপ আযমীগণ (অনারবরা) পরস্প পরস্পরের প্রতি (দণ্ডায়মান হয়ে) সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

আনাস (রাযি.) বলেন, সহাবীদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা প্রিয়তর (এবং অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র) আর কেউ ছিল না, সে সত্ত্বেও যখন তিনি তাদের মাঝে তাশরীফ আনতেন তখন তাঁর সম্মানার্থে তারা দণ্ডায়মান হতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এরূপ দাঁড়ানো মোটেই পছন্দ করেন না (বরং তিনি ঐ অবস্থায় দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন)।

মা'আয (রাযি.) আযমীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা দেখে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ কে সাজদাহ করতে চাইলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন,

انه لا يصلح المسجود الا لله، لوكنت امرا احدا ان يسجد لا حد لامرت المراة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها-

"সাজদাহ একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, তিনি ছাড়া আর কারো জন্যই সাজদাহ সিদ্ধ নয়। আমি যদি কোন মানুষকে অপর কোন মানুষের জন্য সাজদাহ্‌র হুকুম দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে-স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রাপ্য বড় রকম হকের জন্য।"

আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু যখন খলীফা, তখন যিন্দীকদের সেই দলটিকে তার সামনে উপস্থাপন করা হলো যারা আলীকে বলত, প্রভু। আলী (রাযি.) তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারার হুকুম দিলেন।

এই হচ্ছে নাবী রসূল এবং অলী আউলিয়াদের অবস্থা। যারা তাদেরকে বাড়িয়ে তাদেরকে বহু উর্ধ্বে সমাসীন করে, তাদের প্রতি না-হক সম্মান দেখাতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে, তারা পৃথিবীতে অনাচার এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে ধ্বংস ডেকে আনতে চায়, যেমন ফিরআউন এবং তার দলের লোকেরা করেছিল যার পরিণামে তাদের নিস্তনাবুদ হতে হয়েছিল। মাশায়েখদের মধ্যে যারা এরূপ কাজের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে তারাও ফিরআউনেরই গোত্রভুক্ত। নাবী রসূল এবং ওলী আউলিয়াদের জীবিতকালে এই অনাচার সম্ভব হয় না, তাদের মৃত্যুর পর

অথবা অনুপস্থিতিকালে এই অনাচার এবং বাড়াবাড়ি (শয়তানের প্ররোচনায়) প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মেনে দু'আ প্রার্থনা

ঈসা ('আ.)-এর গায়িব হওয়ার এবং উযায়র ('আ.)-এর ইন্তিকালের পর তাদেরকে (আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মেনে নিয়ে) শির্ক করা হয়েছে।

চিন্তা করলে এখানেই উপলব্ধি করা যাবে নাবী ﷺ অথবা কোন সালেহ ওলী-আল্লাহ্‌র জীবিতাবস্থায় তাদের নিকট সওয়াল করার এবং তাদের মৃত্যুর পর অথবা অনুপস্থিতি কালে তাদের স্মরণ করে কিছু সওয়াল করার তথা তাদের নিকট নিজেদের কোন দরখাস্ত পেশ করার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে। আর তাই আমরা দেখতে পাই যে, সহাবীদের যুগে, তাদের পর তাবিয়ীনদের যুগে এবং তাদেরও পর তাবা-তাবিয়ীদের যুগে, এমনকি সমগ্র সলফে সালিহীনের মধ্যে এমন একজন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি কবরের কাছে গিয়ে নামায পড়া পছন্দ করেছেন, অথবা মাযারসমূহে দু'আ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তারা কেউ কখনো না জানিয়েছেন মৃত বুযুর্গ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কোন প্রার্থনা, না পেশ করেছেন কোন ফরিয়াদ। এভাবে সংসারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে কবরের কাছে গিয়ে সাধন ভজনে নীরব থাকারও কোনই প্রামাণ এবং নযীর নেই।

প্রশ্নকারী তার ইস্‌তিফতায় যা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মৃত ওলী আউলিয়া কিংবা অনুপস্থিত কোন পীর মুরশিদের নাম করে এরূপ প্রার্থনা করা যে, হে অমুক সাইয়েদ, হে অমুক পীর! আমার ফরিয়াদ শুনুন, আমার সাহায্য করুন অর্থাৎ তার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধার এবং কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করার প্রার্থনা জ্ঞাপন, তো এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এরূপ প্রর্থানা জ্ঞাপন ও ফরিয়াদ পেশ করণ মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম শির্কের অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টানগণ তো ঈসা ('আ.) সম্বন্ধে এবং তাদের পোপ-বিশপ, পাদরী পুরোহিত ও সন্ন্যাসী দরবেশদের সম্বন্ধে ঠিক এই ধারণাই পোষণ করে থাকে। এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সৃষ্টির মুকুটমণি এবং মনুষ্যকুলের মধ্যে

ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর পবিত্র সাহচর্য ও সংস্পর্শ-ধন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)। এ সত্ত্বেও তারা তাঁর মহাপ্রয়াণের পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতি কালে এক মহূর্তের জন্যও এ ধরনের কোন কাজ করেন নাই।

শির্কের সঙ্গে মিথ্যার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ

মুশরিকরা মহাপাপ তো করেই, তার সঙ্গে তারা মিথ্যাকেও মিশ্রিত করে, আর মিথ্যা হচ্ছে শির্কের অনুগামী, সহমর্মী।

এজন্যই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾

(الحج : ٣٠-٣١)

মূর্তিপূজার কদর্য সংস্পর্শ হতে বেঁচে চলবে তোমরা, আর মিথ্যা কথা হতেও আত্মরক্ষা করে চলবে তোমরা, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই (অনুগত) হয়ে থাকবে তোমরা, কোন প্রকারেই অন্য কিছুকেই তাঁর সহিত শরীক করবে না তোমরা। (সূরা হাজ্জ ৩০ ও ৩১)

আর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, عدلت شهادة الزور بالا شراك بالله–

মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমতুল্য। সূরা আ'রাফে আল্লাহ মুশরিকদের পরিণতি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (اعراف : ١٥٢)

"যে সব লোক বাছুরকে পূজার জন্য গ্রহণ করেছে তাদের উপর শীঘ্রই তাদের পরোয়ারদিগারের তরফ থেকে গযব নেমে আসবে আর (আপতিত হবে) পার্থিব-জীবনে অসম্মান অবমাননা, এভাবেই আমরা মিথ্যা রচনাকারীদরকে প্রতিফল প্রদান করে থাকি।" (সূরা আ'রাফ ১৫২)

আর ইব্‌রাহীম খলীলুল্লার ('আ.) কথা আল্লাহ উধৃত করেছেন এভাবে ঃ

﴿أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الصافات : ٨٦-٨٧)

ইব্‌রাহীম তার পিতা ও স্বজাতিদেরকে প্রশ্ন করছেন, "কী! আল্লাহকে ছেড়ে মিছামিছি অন্য দেবতার পিছনে পড়ে আছ তোমরা, বলতো তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করছ?" (সূরা সাফ্‌ফাত ৮৬ ও ৮৭)

ফলতঃ এদের মিথ্যা সংস্কার ও মিথ্যা ধারণার উপরে গড়ে উঠা একটি আক্বীদাহ এই যে, তারা বিশ্বাস করে যে, পীর যদি অবস্থান করেন পূর্ব দিগন্তে আর মুরীদ থাকে পশ্চিম দিগন্তে তবু তিনি কশ্‌ফের প্রবল আকর্ষণে স্বীয় মুরীদকে নিজের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হন। পীরের মধ্যে যদি এই গুণটি না থাকে তবে সে প্রকৃত পীরই নয়।

কখনও কখনও শয়তান তাদেরকে ঠিক সেভাবেই পথভ্রষ্ট করে থাকে যেভাবে আরবের অধিবাসীদেরকে তাদের বুতপরস্তীতে এবং নক্ষত্র-পূজকদেরকে তাদের শির্কী চাল চলন ও যাদুর ভোজবাজিতে শয়তান স্বীয় চাল চেলে গুমরাহীর পথে পরিচালিত করেছে। এমনিভাবে তাতার, হিন্দ, সুদান প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন রূপী মুশরিকদের মধ্যেও শয়তান নানাভাবে তার প্ররোচনার জাল ফেলে ও ফাঁদ পেতে তাদের পথভ্রষ্ট করেছে। পীরপরস্ত ও মাশায়েখ ভক্তবৃন্দের মধ্যেও এমনিভাবে শয়তান তার গুমরাহী বিস্তারের কাজ চালিয়ে যায়। বিশেষ করে তাদের গানের আসর সঙ্গীতের তালে তালে বাঁশি (ঠুংরী তবলা) ও অন্যান্য বাদক দ্রব্যের সুর ও রাগ রাগিণীতে যখন সবাই বুঁদ হয়ে থাকে তখন শয়তান তাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়ে তার ফাঁদে তাদরকে আটকে ফেলে। মৃত নাবী অথবা অলী-আউলিয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা জ্ঞাপনের আর একটি প্রকরণ হচ্ছে এরূপ ঃ যেমন কেউ বলে, "হে আল্লাহ! অমুক নাবী বা পীরের সম্মানে, বা অমুকের বরকতে বা অমুকের মাহাত্ম্যে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দাও, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর।" এ ধরনের কাজ (অধুনা) অনেকেই করে থাকে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং আয়িম্মায়ে সলফ থেকে এ ধরনের কাজের সমর্থনে কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদের দু'আয় তারা এ ধরনের কোন কথা বলেছেন-এমন কোন নযীর দেখতে পাওয়া যায় না। এ কাজে ওলামায়ে-দ্বীনের

এমন কোন কওল, কোন সমর্থন আমার কাছে পৌছায়নি যা আমি এখানে উধৃত করতে পারি। ফকীহ আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিস সালামের সেই ফতোয়াটি আমি দেখেছি যাতে তিনি বলেছেন যে, একমাত্র নাবী ﷺ ছাড়া অপর আর কারোর জন্য এরূপ করা জায়িয নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এর তুফায়লে দু'আ করার সমর্থনে যে হাদীস পেশ করা হয় তা যদি সহীহ হয় তাহলে বেশীর বেশী শুধু নাবী ﷺ মাহাত্মের উল্লেখে আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ দু'আ করা যেতে পারে। (কিন্তু এ কথাও পরীক্ষা সাপেক্ষ যার পর্যালোচনা ও মন্তব্য পরে আসছে-অনুবাদক) প্রশ্নের জবাবে উক্ত ফকীহ তার ফতোয়ায় যা লেখেছেন তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সহাবীকে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اللهم انى اسألك واتوسل اليك بنبيك نبى الرحمة، يا محمد يارسول الله انى اتوسل بك الى ربى فى حاجتى ليقضيهالى-اللهم فشفعه فى-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটেই আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি আর আপনার নাবী, রহমাতের নাবী ﷺ কে আপনার সমীপে ওয়াসীলা স্বরূপ (মাধ্যম রূপে) পেশ করছি- হে মুহাম্মাদ, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে আমার প্রয়োজনে আমার প্রভু পরোয়ারদিগারের দিকে ওয়াসীলা স্বরূপ পেশ করছি, (আপনার ওয়াসীলায়) যেন তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেন। অতএব হে আল্লাহ! আমার সম্বন্ধে তাঁর সুপারিশ আপনি মঞ্জুর করুন।"

এই হাদীস দ্বারা কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবিতকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তাকে ওয়াসীলা ধরার সিদ্ধতা প্রমাণ করতে চান। তারা বলতে চান, এতে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টির নিকট দু'আ প্রার্থনা অথবা অভিযোগ পেশ করা হচ্ছে না বরং শুধু রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার তুফাইলে আল্লাহ্‌র নিকটেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ্‌র সেই হাদীসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যাতে রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে নিষ্ক্রমণকারীকে এই দু'আ পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন ঃ

اللهم انى اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولارياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذنى من النار وان تغفرلى ذنوبى فانه لا يغفر الذنوب الا انت-

"প্রভু হে! নিশ্চয় আমি প্রার্থনাকারী এবং নামাযের দিকে গমনকারীদের হক এর দাবীতে (তাদের ওয়াসীলায়) তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, নামাযের উদ্দেশে আমার বের হওয়ার মধ্যে নেই কোন অহঙ্কার ও গর্বের মনোভাব, নেই এর পেছনে কোন কিছু লোক দেখানো ও শোনানোর বাতিক, আমি বের হয়েছি তোমার রোষ থেকে বাঁচার ব্যাকুলতায় এবং তোমার সন্তোষ লাভের আগ্রহ-উৎসাহের তাকীদে। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, আমার গুনাহ্ খাতা মাফ করে দাও, তুমি ছাড়া আর কেউই গুনাহ্ খাতা মাফ করতে পারে না।"

তারা বলে থাকেন, এই হাদীসে প্রার্থনাকারী এবং নামাযে গমনকারীদের আল্লাহ্র উপর হকের দাবীতে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা এ দাবীর সমর্থনে আরও বলেন যে, আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে নিজের উপর বান্দার হক স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন তিনি কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم : ٤٧)

"মুমিনদের সাহায্য করা আমার উপর তাদের হক অর্থাৎ পাপ্য অধিকার।" (সূরা রূম ৪৭)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾

"তোমার প্রভু পরোয়ারদিগার নিজের উপর তাঁর প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন- যা তাঁর নিকট চাওয়া যেতে পারে।"

(সূরা আল ফুরকান ১৬)

বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক সংক্রান্ত হাদীস

সহীহ্ বুখারীতে মু'আয ইবনে জাবাল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেছেন ঃ

يامعاذ، اتدرى ماحق الله على البعاد، قال الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا - اتدرى ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذالك فان حقهم عليه ان لا يعذبهم-

"হে মু'আয! তুমি কি জান যে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? মু'আয বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ﷺ অধিকতর জ্ঞান রাখেন।"

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র হক এই যে, (যেহেতু তিনিই খালেক ও মালেক কাজেই) তারা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বরণ করবে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অপর কাউকেই শরীক করবে না। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, "মু'আয! তুমি কি জান, যখন তারা আল্লাহ্র উক্ত হক আদায় করবে তখন আল্লাহ্র নিকট বান্দার হক কী? তিনি নিজেই উত্তরে বললেন, বান্দা যখন আল্লাহ্র হক আদায় করবে তখন আল্লাহ্র নিকট বান্দার পাপ্য হক অধিকার হবে এই যে, তিনি তাদেরকে (তাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য) শাস্তি প্রদান করবেন না।"

কোন কোন হাদীসে এই হক সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রসূল ﷺ বলেছেন,

"মদ্যপায়ীর চল্লিশ দিবসের নামায কবুল হয় না। সে যদি তাওবাহ্ করে তবে আল্লাহ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। তারপর এই তাওবাহ্র পর আবার যদি সে মদ খাওয়া শুরু করে দেয় তবে (দ্বিতীয়বারও তাকে অনুরূপ তাওবাহ্য় আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু)" তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় আল্লাহ্র এ অধিকার বর্তে যায় যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হল 'তীনাতুল খাবাল' কী? তিনি বললেন, তা জাহান্নামের অধিবাসীদের জন্য পানের অযোগ্য পানীয়ের তলানি।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলার অসিদ্ধতা

আলিমদের অপর একদল বলেন, এ সব দলীল দ্বারা রসূল ﷺ এর ইন্তিকালের পর এবং অনুপস্থিতিকালে তাঁর ওয়াসীলা ধরার সিদ্ধতা মোটেই প্রমাণিত হয় না এবং কেবলমাত্র তাঁর জীবিতকালে এবং তার উপস্থিতিতেই 'ওয়াসীলাহ্‌র সিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। যেমন সহীহ বুখারীতে রিওয়ায়াত এসেছে যে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আব্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

"হে আল্লাহ! যতদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, ততদিন আমরা আমাদের নাবীর মাধ্যমে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা জানিয়েছি। ফলে তুমি বৃষ্টি প্রদান করেছ। এখন (তাঁর অনুপস্থিতিতে) আমাদের নাবীর চাচার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি, অতএব তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হয়েছে। ফারুকে আযম এই ঘটনার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেবল জীবিতকালেই এ ধরনের ব্যাপারে তারা তাঁর ওয়াসীলা ধরেছেন এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। এই ওয়াসীলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, লোকেরা তাঁর নিকট এসে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আর আবেদন জানাতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন আর সহাবাগণ তার সঙ্গে দু'আয় সামিল হতেন। তারা এভাবে রসূল ﷺ এর সুপারিশ এবং দু'আর ওয়াসীলা ধরতেন অর্থাৎ রসূল ﷺ এর সুপারিশ এবং দু'আই হচ্ছে তাঁর ওয়াসীলা। এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে নিম্ন বর্ণিত হাদীস থেকে।

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি জুমু'আহ্‌র দিবস মাসজিদে নববীতে আগমন করল। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন খুৎবাহ দিচ্ছেলেন। ঐ ব্যক্তি রসূল ﷺ এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে) সম্পদ ফল ফসলাদি ধ্বংস

হয়ে গেল, রাস্তাঘাট (এ চলাচল) বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে দু'আ করুন। রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আর জন্য দু'হাত তুললেন এবং বললেন, "প্রভু হে! বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিন- আমাদের উপর থেকে, বৃষ্টি দিতে থাকুন টীলায়, পাহাড়ে উপত্যকায়, মুক্ত প্রান্তর, বনে জঙ্গলে।

রাবী বলেন, এই দু'আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম তখন আকাশ মেঘমুক্ত, সূর্যের প্রখর রৌদ্রে আমরা পথ চলতে লাগলাম।

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে আবেদন জানালো ঃ

ادع الله لنا ان يمسكها عنا-

ওগো আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরগাহে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দু'আর আবেদন জানান হত আর এটাই হচ্ছে তাঁর ওয়াসীলা ধরা।

বুখারী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযি) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, 'আলী (রাযি.)-এর পিতা আবূ তালিব রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসায় যে কথা বলতেন তা আমার বেশ মনে পড়ে।

তিনি বলতেন ঃ

وابيض ايستسقى الغمام بوجهه-ثمال لليتامى عصمة للارامل-

অর্থাৎ সেই শুভ্র-বদন যাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যের তুফাইলে বৃষ্টির জন্য দু'আ প্রার্থনা করা হয়; তিনি হচ্ছে ইয়াতিমদের আশ্রয়স্থল আর বিধবাদের শরণ-কেন্দ্র।

ফলকথা এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় পানি বর্ষণের জন্য তাঁর ওয়াসীলার আশ্রয় নেয়া হত। অর্থাৎ তাঁর নিকট দু'আর বাসনা জানানো হত। আর তাঁর মহা প্রয়াণের পর তাঁর চাচা আব্বাস (রাযি.)-এর মাধ্যমে পানি বর্ষণের জন্য দু'আ করা হ'ত।

কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পর অথবা তাঁর অনুপস্থিতি কালে কিংবা তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর ওয়াসীলা করা হ'ত না, তিনি ছাড়া অন্য কারও কবরের কাছে গিয়েও পানি চাওয়া হ'ত না।

এভাবে আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফ্য়ান ইয়াযিদ ইব্নে আসওয়াদ জারশীকে ইমাম বানিয়ে পানির জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিদেরকে তোমার সম্মুখে সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত করেছি- হে ইয়াযীদ! আল্লাহ্র দরবারে দু'আর জন্য হাত উঠাও।"

তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন আর উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা রহমতের পানি বর্ষণ করলেন।

এ জন্যই উলামায়ে কিরামের মতে মুত্তাকী এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের দ্বারা দু'আ করানো মুস্তাহাব। সুপারিশকারী ব্যক্তি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এর আহলে বায়তের মধ্য থেকে হন তবে সর্বোত্তম, কিন্তু কোন আলিমই কোন নাবী অথবা কোন সালেহ বান্দার মৃত্যুর পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে পানি বর্ষণের জন্য তাঁর ওয়াসীলায় দু'আ করা শরীঅত সম্মত কাজ বলে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। অনুরূপভাবে কোন দুশ্মনের উপর বিজয় লাভের জন্য কিংবা অন্য কোনরূপ প্রার্থনায় তাঁদের ওয়াসীলারূপে পেশ করা জায়িয বলেননি। এরূপ কাজকে কোন আলিম মুস্তাহাবও বলেননি।

দু'আ তো সকল ইবাদাতের মস্তিষ্ক স্বরূপ আর ইবাদাতের ভিত্তি, নাবী ﷺ এর সুন্নাত এবং তাঁর ইত্তিবা (অনুসরণ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

হৃদয়ের বাসনা কামনা এবং স্বকপোলকল্পিত ও নব উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপরেও ইবাদাতের বুনিয়াদ কায়িম নয়। সেই ইবাদাতই আল্লাহ্র ইবাদাতরূপে গণ্য হবে যা শরীয়ত সম্মত। যে ইবাদাত প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে এবং নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিতে করা হবে, তা কস্মিনকালে আল্লাহর ইবাদত রূপে গণ্য হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (شورى : ٢١)

অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কতক শরীক (বিধানদাতা) কল্পনা করে নিয়েছে যারা তাদের জন্য এমন বিধান প্রদান করে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই? (সূরা শূরা ২১)

বরং আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন ঃ

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (اعراف : ٥٥)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারকে আহ্বান করো বিনয় নম্র অন্তরে এবং মনে মনে-সংগোপনে, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল আ'রাফ ৫৫)

আর রসূলুল্লাহ ﷺ হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

سيكون فى هذه الامة قوم يعتدن فى الدعاء والطهور–

অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব অবশ্যই ঘটবে যারা দু'আ এবং পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে ন্যায়ের সীমারেখা অতিক্রম করে চলবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি বিপদে নিপতিত হয়ে অথবা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যদি তার পীর মুর্শিদের নিকট এই বলে সাহায্য প্রার্থনা করে যে, তার পীর যেন তার সন্ত্রস্ত হৃদয়ের অস্থিরতা দূর করে তাতে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা আনয়ন করেন, তা হলে সে কাজ হবে সুস্পষ্ট শির্ক আর সে শির্ক হবে খৃষ্ট ধর্মে প্রচলিত শির্কের একটি প্রকরণ।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন একমাত্র সত্তা যিনি রহমত এনায়েত করে হৃদয়ে প্রশান্তি বিধান করেন আর তিনিই সেই একমাত্র সত্তা যিনি বিপদ আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা উদ্বেগের অনিষ্ট অপসারিত করে থাকেন।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾

(يونس : ١٠٧)

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন যাতনা-ক্লেশ (অথবা বিপদ আপদ) পৌঁছিয়ে দেন, তা হলে কেউ নেই তার মোচনকারী, নেই এমন কেউ যে হটিয়ে দিতে সক্ষম আর আল্লাহ যদি তোমার কোন মঙ্গল চান, তবে তা রদ করবারও কেউ নেই। (সূরা ইউনুস ১০৭)

তিনি আবার বলেন ঃ

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (فاطر : ٢)

আল্লাহ মানুষের জন্য স্বয়ং তাঁর রহমতের যে দুয়ার খুলে দেন, তা বন্ধ করে দেবার মত কেউ নেই, আর তিনিই যে প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞামণ্ডিত।
(সূরা আল্-ফাতির ২)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ-بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾

(হে রসূল) আপনি বলে দিন, "আচ্ছা দেখ তো, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব এসে যায় অথবা তোমাদের উপর যদি কিয়ামাত আপতিত হয় তখন কি তোমরা (সাহায্য ও আশ্রয়ের জন্য) ডাকবে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে (যাদেরকে তোমাদের দেবতারূপে গ্রহণ করেছ)? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক- (তবে এর জবাব দাও) না, বরং তাঁকেই (একক প্রভু-পরোয়ারদিগারকেই) তোমরা ডাকবে। তখন যে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে তোমরা ডাকবে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন সেই বিপদ তিনি দূর করে দেবেন, আর যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক ধরে নিয়েছিলে (সেই বিপদের দিনে) তাদেরকে তোমরা ভুলে যাবে। (সূরা আন্'আম ৪০-৪১)

সূরা বানী ইসরাঈলে আল্লাহ বলেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (بنی اسرائیل : ٥٦-٥٧)

(হে পয়গম্বর!) আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে বিপদ উদ্ধারকারী মনে করে নিয়েছ তাদেরকে ডেকে দেখ! (ডেকে ডেকে ব্যর্থ হবে, তখন বুঝতে পারবে) তোমাদের দুঃখ-ক্লেশ দূর করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই, তার কোন পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতাও তারা রাখে না।

যাদেরকে এরা আহ্বান করে তারাই তো স্বীয় প্রভুর নৈকট্য লাভের জন্য 'ওয়াসীলা'র সন্ধান করে বেড়ায় এজন্য যে, কে (তাদের মধ্যে) অধিকতর নিকটবর্তী, আর তারা আল্লাহ্‌র দয়া প্রত্যাশা করে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) তাঁর শাস্তিকে ভয় ক'রে চলে, নিশ্চয় আপনার প্রভু-প্রতিপালকের শাস্তি ভয়েরই যোগ্য-ভয়াবহ। (সূরা বানী ইসরাঈল ৫৬ ও ৫৭)

উপরে সংকলিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং খোলাসা করে দিয়েছেন যে, যে সব লোক বিপদত্রাণের জন্য ফেরেশতা, নাবী-রসূল, ওলী-আউলিয়া, পীর মুরশিদ প্রমুখকে ডেকে থাকে, "তারা লা ইয়ামলেকুনা কাশফায্ যুররে ওলা তাহবীলা" দুঃখ-ক্লেশ বিপদ আপদ দূর করার অথবা তার পরিবর্তন সাধনের কোন ক্ষমতাই রাখে না। তারা বর্তমানের বিপদও দূর করতে পারে না, ভবিষ্যতের দুঃখ কষ্ট প্রতিরোধের ক্ষমতাও তাদের নেই। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি আমার শায়খ তথা পীর মুরশিদকে এ জন্যই ডাকি যে, তিনি হবেন আমার সুপারিশকারী, তবে সে খৃষ্টান এবং তাদের পোপ, বিশপ ও সন্ন্যাসীদের মত ও পথকেই অবলম্বন করবে, মুমিন মুসলিমদের পথ এটা নয়। মুমিন একমাত্র তার প্রভু পরোয়ারদিগারের অনুগ্রহেরই প্রত্যাশী এবং তাঁরই শাস্তির ভয়ে ভীত, সদা সন্ত্রস্ত। একনিষ্ঠভাবে অকপট মনে সে তার প্রভুকেই ডেকে থাকে। পীর মুরশিদের কাজ হচ্ছে তার মুরীদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা এবং তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা।

এ কথা কস্মিনকালে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সম্মান ও মর্যাদায় সৃষ্টিকুলের সেরা হচ্ছে আমাদের রসূল ﷺ! আর এর সঙ্গে এ কথাও হৃদয়ে গেঁথে রাখা প্রয়োজন যে, সহাবাগণ যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর অমিয় বাণী শুনেছেন, তার সমুদয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই হচ্ছেন রসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ নিষেধ এবং শরীয়াতের হুকুম আহকাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানবান। তাঁর সম্মান ও মান মর্যাদা সম্পর্কে তারাই অধিকতর ওয়াকেফহাল। আর তারাই ছিলেন তাঁর সর্বাধিক অনুগত-হুকুমবরদার।

সেই পাক-পূত মানব মুকুট, রসূল-শ্রেষ্ঠ ও নাবী-সম্রাট তাঁর সহচরদের কাউকেই কখনও এ হুকুম দেননি যে, ভয়-ভীতি এবং বিপদ আপদ ও দুঃঃখ ক্লেশের সময় 'ইয়া সাইয়েদী', হে আল্লাহ্র রসূল! হে আমাদের নেতা, হে আল্লাহর রসূল- বলে ডেকো। আর সহাবাগণের মধ্যে কেউ– না নাবী ﷺ এর জীবিতকালে, না তাঁর ওফাতের পরে এরূপভাবে তাঁকে ডেকেছেন।

বরং তিনি ডাকতে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহকেই এবং নির্ভর করতে বলেছেন একমাত্র তাঁরই উপরে।

আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই নিকট দু'আ প্রার্থনার তাকীদ

কুরআন মাজীদের সূরা আলু ইমরানে আল্লাহ মর্দে মুমিনদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ (ال عمران : ١٧٣-١٧٤)

তারা সেই লোক যাদেরকে লোকেরা এসে খবর দিল যে, (তোমাদের দুশমন) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে! এ কথা শ্রবণ করার পর (মর্দে মুমিনগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে বরং) তাদের ঈমান

আরও বর্ধিত হলো, বল দৃঢ়তর হয়ে উঠল আর তারা বলে উঠল ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আর তিনি হচ্ছেন কারসাজরূপে উত্তম; তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে আল্লাহ্র নিয়ামাত এবং অনুগ্রহ রাশি দ্বারা পুষ্ট হয়ে তারা বিজয়ী বেশে ফিরে এল, কোন রূপ অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করতে পারল না, কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পন্থাই তারা অনুসরণ করেছিল। আর জেনে রাখো, আল্লাহ হচ্ছেন অতীব অনুগ্রহপরায়ণ। (সূরা আলু ইমরান ১৭৩ ও ৭৪)

এখন হাদীস থেকে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করা যাচ্ছে ঃ

সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত ঃ (حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ)

আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং কারসাজরূপে কতই না উত্তম- এই কালেমা ইব্রাহীম ('আ.) সেই মহা বিপদের সময় উচ্চারণ করেছিলেন যখন কাফিরের দল তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, আর রসূলুল্লাহ ﷺ সেই সময় তা পাঠ করেছিলেন, যখন লোকেরা এসে তাঁকে খবর দিল যে,

(اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ)

"আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাদের বিরুদ্ধবাদী (মাক্কাহ্র) লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে।"

২। বুখারীতে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বিপদাপদে-উদ্বেগ আকুলতার সময় এই কালেমা পাঠ করতেন ঃ

«لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ».

"নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি মহান, যিনি সহিষ্ণু, নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি মহিমান্বিত আরশের অধিপতি, নেই কোন আরাধানার যোগ্য-উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের প্রভু প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রভু পরোয়ারদিগার।"

হাদীসে আছে যে, নাবী ﷺ এ ধরনের বহু দু'আ তাঁর পরিবার-পরিজনকে শিখিয়েছিলেন।

সুনান হাদীস গ্রন্থ সমূহে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকলীফ অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট যাতনার সময় এই দু'আ পড়তেন ঃ

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ-

হে চিরঞ্জীব, হে চিরবিদ্যমান। আপনার রহমাতের আমি ভিখারী।

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাহ (রাযি.)-কে এই দু'আ শিখিয়েছিলেন-

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَا بَدِيْعُ اسَّموَاتِ وَلاَرْضِ لاَالٰهَ اِلاَّ اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ اِلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلاَ اِلى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ-

হে চিরস্থায়ী! হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক! নেই কোন উপাস্য প্রভু-পরোয়ার্দিগার তুমি ভিন্ন, আমি তোমার রহমাতের ভিখারী! আমার সমস্ত কাজকর্ম বিশুদ্ধ করে দাও! আর চোখের একটি পলকের জন্যও আমার নিজের উপর আমাকে ছেড়ে দিওনা- তোমার সৃষ্টির মধ্যে আর কারোর উপরেও নয় (সর্বক্ষণ আমাকে একমাত্র তোমারই হিফাযাতে রেখো)।

৫। মুসনাদে ইমাম আহমাদ এবং সহীহ আবি হাতিমে রিওয়ায়াত এসেছে যে, ইবনে মাসউদ (রাযি.) রসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ

যে ব্যক্তি বিপদ আপদে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সময়ে নিম্নের এই দু'আ খালেস অন্তরে পাঠ করে, আল্লাহ আ'আলা তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, তার মনের অস্থিরতা এবং বিচলিত অবস্থা দূর করে দেন এবং তৎপরিবর্তে মনে আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দেন ঃ

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي»

"প্রভু হে! আমি তোমারই দাস, আর তোমার দাসের পুত্র এবং তোমার দাসীর পুত্র (অর্থাৎ আমি নিজেও তোমার দাস এবং আমার পিতা-মাতাও তোমার দাস-দাসী) আমার কপাল অর্থাৎ আমার সত্তা তোমারই হস্তে, তোমার প্রতিটি হুকুম আমার উপর প্রযোজ্য (এবং অবশ্য প্রতিপাল্য) আমার সম্বন্ধে তোমার প্রতিটি ফয়সালা ইনসাফ তথা ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি তোমার প্রত্যেক সেই নামে (যে নামে তুমি সুপরিচিত) যে নাম তুমি তোমার নিজের জন্য নির্বাচন করেছ অথবা যা তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছ অথবা যা তোমার কোন সৃষ্টজীবকে তুমি শিক্ষা দিয়েছ অথবা যা তুমি ইল্‌মে গায়িবের খাজানায় নিজের কাছেই সুরক্ষিত রেখেছ- তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তুমি কুরআনে আযীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত ও আমার চোখের জ্যোতি বানিয়ে দাও, ঐ কুরআনকে আমার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অপসারণ এবং আমার চিন্তা ভাবনা দূরীকরণের মাধ্যম করে দাও।"

সহাবীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি এই দু'আ শিখে মুখস্থ করে নিব? তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ শুনবে, সে যেন তা শিখে মুখস্থ করে নেয়।

৬। রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের শিক্ষা এবং হুশিয়ারীর জন্য আরও বলেন ঃ

ان الشمس والقمر ايا تان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فانزعوا الى الصلوة وذكر الله والاستغفار-

"সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর অসীম কুদ্‌রতের বহু নিদর্শনের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো জন্ম অথবা মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে তাঁর শক্তিমত্তা এবং মহিমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন মাত্র। যখন তোমরা তোমাদের তখন ভয়ে

সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা পানাহ চাবে- সলাত, আল্লাহর যিক্‌র আযকার ও ইস্‌তিগফারের মাধ্যমে।" তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় সলাত পড়ার, দু'আ করার, দান খয়রাত করার এবং গোলাম আজাদ করার আদেশ প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে এ কথা বলেননি যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় কোন সৃষ্ট জীব বা বস্তু, কোন ফেরেশতা, কোন নাবী, কোন ওলী আউলিয়াকে সাহায্যের জন্য ডাকবে!

আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হওয়ার এ ধরনের বহু শিক্ষাই রসূল ﷺ এর সুন্নাতে প্রচুর মওজুদ রয়েছে যার থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত হয়ে যায় যে, মুসলমদের বিপদ আপদ ও ভয় ভীতিতে অন্য কিছু করাই সিদ্ধ নয়, একমাত্র শুধু তা-ই করা শরী'আত সিদ্ধ- যা আল্লাহ করতে বলেছেন অর্থাৎ তোমরা সরাসরি আল্লাহকে ডাক, শুধু তাঁরই নিকট আবেদন জানাও, তাঁরই যিক্‌র-আয্‌কারে প্রবৃত্ত হও ও গোলাম আজাদ করো, সদ্‌কাহ্‌ দিতে থাকো এবং এই ধরনের অন্যবিধ দান খয়রাত করে চলো। এরপর আল্লাহর প্রতি প্রত্যয়শীল একজন মু'মিন মুসলমানের পক্ষে কী করে এটা সম্ভব হতে পারে যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ এর নির্ধারিত ও প্রদর্শিত পথ ছেড়ে সেই বিদ'আত এবং গুমরাহীর পথ সে বেছে নেবে যার সমর্থনে শরী'আতে কোনই দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। উক্ত কাজ নাসারা এবং মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আকর্ষণ

যদি কেউ এই কথা বলে যে, এভাবে মৃত বুযুর্গ ব্যক্তিকে ডাকার ফলে তার অভাব দূর হয়েছে, তার প্রয়োজন মিটে গেছে এবং বুযুর্গ ব্যক্তির চেহারা তার সম্মুখে ভেসে উঠেছে, তাহলে তার জানা প্রয়োজন যে, নক্ষত্র-পূজক, মূর্তি পূজক প্রভৃতি মুশরিকদের বেলাতেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে থাকে। বস্তুতঃ অতীত কালে এবং বর্তমান মুশরিকদের এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা যদি প্রকাশিত না হতো তা হলে মূর্তি প্রভৃতির পূজায় কেউ কোন দিনই আত্মনিয়োগ করত না।

কুরআন মাজীদেই আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাই। ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ ('আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন ঃ

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ (ابراهيم ٣٥-٣٦)

"আর আমাকে এবং আমার সন্তানসন্ততিকে তুমি মূর্তি ও প্রতীক পূজা থেকে দূরে রেখো, প্রভু হে! নিশ্চয় ওগুলো (ঐ মূর্তি ও প্রতীকগুলো) বহু মানুষকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।" (সূরা ইব্‌রাহীম ৩৫ ও ৩৬)*

*** নোট ঃ** ইব্‌রাহীম ('আ.)-এর এই দু'আ কবুল হয়েছিল। তাঁর দুই পুত্র ইসমাঈল ('আ.) ও ইসহাক ('আ.) পৌত্তলিকতার সংস্রব থেকে শুধু নিজেরাই দূরে অবস্থান করেন নাই, তারা অন্যকেও মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ইসহাক ('আ.)-এর পুত্র ইয়াকুব ('আ.) জীবনভর এই সাধানায় রত থেকে মৃত্যুর প্রাক্কালে তার পুত্রদের ডেকে যখন জিজ্ঞেস করেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে? তখন তারা এক বাক্যে উত্তর দিয়ে ছিলেন, আমরা আপনার প্রভু পরোয়ারদিগারের এবং আপনার পিতৃ পুরুষ-ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের সেই এক ও একক আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করব এবং তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত মুসলিম আমরা। (সূরা আল-বাকারা ১৩৩)

ইয়াকুব ('আ.)-এর নাবী-পুত্র ইউসুফ ('আ.) কারাগারে বসেও তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি কারাগারেই ঘোষণা করেছেন ঃ আমি অনুসরণ করে চলেছি আমার পিতৃ পুরুষ ইব্রাহীমের, ইসহাকের ও ইয়াকুবের মিল্লাতের। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কিছুকেই শরীক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।...

তারপর তিনি কারাগারে তাঁর দুই সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! (বল দেখি!) বহু বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরই শ্রেয়, না এক অদ্বিতীয় পরম-পরাক্রান্ত আল্লাহ?"

"তিনি ব্যতীত আর যা কিছুর পূজা অর্চনা তোমরা করে আসছ সেগুলো তো (অবাস্তব) নামমাত্র-যেগুলোর নামকরণ করেছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, যার সম্বন্ধে আল্লাহ কোনই সনদ নাযিল করেন নাই। জেনে রাখো, হুকুমের একমাত্র মালিক তো হচ্ছে আল্লাহ। তিনি আদেশ করেছেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই বন্দেগী করবে না। এটাই হচ্ছে সত্য ও সুদৃঢ় ধর্ম! কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"(সূরা ইউসুফ ৩৮-৪০; অনুবাদক)

কথিত আছে যে, ইব্‌রাহীম ('আ.)-এর পর মাক্কাহ্‌য় প্রথম শির্কের আমদানী করে আম্‌র ইবনে লাহয়ীল খাযায়ী যাকে রসূল ﷺ দোযখে এই অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তার নাড়িভুঁড়ি পড়ে আছে আর সে তা টেনে বেড়াচ্ছে! *

প্রথম প্রথম সে (মাক্কাহ্‌য়) ষাড় ছেড়ে দিয়েছিল এবং সে-ই সর্বপ্রথম (মাক্কাহ্‌য়) দ্বীনে ইব্‌রাহীম অর্থাৎ খালেস তাওহীদের ধর্মকে মিটিয়ে দিয়েছিল। কথিত আছে যে, সে সিরিয়ায় গিয়ে বাল্‌কা নামক স্থানে মূর্তি পূজার প্রচলন দেখতে পায়। সেখানে লোকদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রতিমাগুলো তাদের কল্যাণ বিধান এবং অকল্যাণ ও ক্ষয়ক্ষতি দূরীকরণে সহায়তা করে থাকে। ফলে সে ঐ মূর্তিগুলোকে মাক্কাহ্‌য় স্থানান্তরিত করলো। এভাবে সে মাক্কাহ্‌য় মূর্তিপূজার মাধ্যমে শির্কের রেওয়াজ প্রবর্তন করল। সে সেখানে সেই সব নিষিদ্ধ কাজের প্রথা জারি করে দিল যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণ হারাম করে দিয়েছেন। সেই নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ শির্ক, যাদু, না হক খুনখারাবী, ব্যাভিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রভৃতি। এই সব পাপক্রিয়ায় মানুষ আকৃষ্ট হয় কখনও নফসে আম্মারার তাকীদে অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় আর কখনও অজ্ঞানতার কারণে।

মনের অসৎ প্রবণতা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্তির পথ আছে বলে মিথ্যা ধারণা জন্মায়। এই মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি না হলে সে কিছুতেই এমন কাজে প্রবৃত্ত হতো না যার ভিতর দৃশতঃ কোন কল্যাণ নেই।

অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় শির্ক এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের ফাঁদে কেন মানুষ পা দেয় তার খোলাসা বিবরণ অতঃপর পেশ করা হচ্ছে।

শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার দু'টি প্রধান কারণ ঃ অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ

অজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাকীদ মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের দিকে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জ্ঞান রাখে যে, অমুক কাজটি খারাপ ও ক্ষতিকর এবং শরী'আত নিষিদ্ধ, সে কী করে জেনে শুনে ক্ষতিকর কাজ করতে পারে?

সে সব লোক নিষিদ্ধ কাজ করে চলে তাদের মধ্যে রয়েছে কতক জাহেল এবং নাদান-অজ্ঞ এবং ভালমন্দের বোধ-রহিত। তারা উক্ত কাজের ক্ষতি এবং অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অনুভূতি শূন্য। বাকী লোকের মনে এ বোধ রয়েছে যে, কাজটি অন্যায় কিন্তু তারা উক্ত কাজের প্রতি প্রলুব্ধ এবং এক অন্ধ আবেগে আকর্ষিত। উৎকট কাম ভাব এবং ভোগ প্রবৃত্তি তাদের হৃদয়কে অস্থির এবং চঞ্চল করে তোলে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন নিষিদ্ধ কাজে যে ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি নিহিত রয়েছে- উক্ত কাজের সাময়িক আনন্দে ও সম্ভোগের মোহে তা আরও বর্ধিত হয়। কী ভয়ঙ্কর পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে সে তা মোটেই অনুধাবন করে না। অজ্ঞতার কারণে সে উক্ত ক্ষতি সম্পর্কে অনবহিত থেকে যায়। কিংবা ভোগ লিপ্সা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে একেবারে অন্ধ করে ফেলে। সে তার প্রবৃত্তির কেনা গোলামে পরিণত হয়। সে যা হক এবং প্রকৃত সত্য তা মোটেই অনুধাবন করতে পারে না। কেননা (হাদীসে এসেছে)

حُبُّكَ الشَّيْئَ يُعْمِى وَيُصِمُّ-

"কোন বস্তুর প্রেম অথবা কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ তোমাকে অন্ধ এবং বধির করে ফেলে। এজন্যই বলা হয়েছে, সাহেবে ইল্‌ম তথা বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে থাকে।"

আবূ আলীয়া বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহাবীগণকে এই আয়াতের অর্থ এবং তাৎপর্য জিজ্ঞেস করি ঃ

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (النساء ١٧)

"বস্তুতঃ আল্লাহ সেই সব লোকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হন, তাদের তাওবাহ কবুল করেন যারা অপকর্ম করে থাকে অজ্ঞতা বশতঃ তারপর (সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর) শীঘ্রই (আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গিয়ে) তাওবাহ করে থাকে।

[আল্লাহ কবুল করে থাকেন এই শ্রেণীর লোকদের তাওবাহ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।]" (সূরা আন-নিসা ১৭)

আবূ আলীয়া সহাবীগণের নিকট থেকে এই আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে যে উত্তর পেয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখিত হয়নি।

(তবে অন্যত্র দেখা যায় যে, সহাবীরা বলতেন যে, মানুষের দ্বারা যে গুনাহের কাজই সংঘটিত হয়ে থাকে তা ঘটে থাকে জাহেলী তথা অজ্ঞতা এবং জ্ঞানবিভ্রমের জন্যই।)

শরী'আতে যে সব কাজ নিষেধ হয়েছে তাতে (অপপ্রভাব-বিস্তারী) কী কী ক্ষতি নিহিত রয়েছে এবং শরী'আতে যে সব কাজের আদেশ প্রদান করা হয়েছে তাতেই বা কী কী (শুভ প্রভাব বিস্তারী) কল্যাণ রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে মুমিন ব্যক্তির জন্য এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব কাজের হুকুম দিয়েছেন সেগুলো হয় পুরাপুরি কল্যাণের প্রতীক নতুবা তার ভিতরে রয়েছে কল্যাণের আধিক্য। আর যে সব কাজ তিনি করতে নিষেধ করেছেন তা হয় পুরাপুরি অকল্যাণের প্রতীক নতুবা তাতে অকল্যাণের আধিক্য রয়েছে। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব কাজের জন্য মনুষ্য জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন তাতে এরূপ মনে করার কারণ নেই যে , তাতে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন প্রয়োজন রয়েছে বরং তাতে মানুষের নিজেরই কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। আর যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তা করলে মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (اعراف : ١٥٧)

"রসূল ﷺ তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেন ও অসৎ কর্ম থেকে বারণ করেন আর পবিত্র জিনিসকে হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করে দেন।" (সূরা আরাফ ১৫৭)

এখন কবরের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। মুসলিমদের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে কবর মাজারে তা যে কোন ওলী-আউলিয়া, পীর পয়গাম্বরের

হোক না কেন হাত রাখা, চুম্বন করা, তাতে মুখ-গাল স্পর্শ করানো নিষিদ্ধ। প্রাথমিক যুগের কোন উম্মত এবং সে যুগের কোন ইমাম এরূপ কখনও করেননি। এ হচ্ছে এক প্রকারের শির্ক। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ (نوح : ٢٣-٢٤)

নূহের কউমের লোকেরা তাদের স্বজাতিকে বলত, "নিজেদের আরাধ্য ঈশ্বরকে কোন মতেই বর্জন করবে না, বিশেষতঃ ওয়াদ্দাকে, সুওয়াকে এবং ইয়াগূসকে, ইয়াউককে এবং নাস্‌রকে। তাদের প্রধানগণ (এভাবে) বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।" (সূরা নূহ ২৩ ও ২৪)

এ সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে, উপরের উদ্ধৃত ওয়াদ্দা, সুওয়া প্রভৃতি নূহ ('আ.)-এর কউমের পূর্ব পুরুষদের কতিপয় সাধু ব্যক্তির নাম ছিল। কালক্রমে তাদের মাজার মানুষের যিয়ারত এবং ই'তিকাফের স্থানে পরিণত হয় এবং গোরপূজায় এর শেষ পরিণত ঘটে। সর্বশেষে মানুষ তাদের মূর্তি তৈরী করে মূর্তি পূজা শুরু করে দেয়।

বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ ভক্তির এই অশুভ পরিণতির কারণেই মাজার সমূহের স্পর্শ, চুম্বন, তার উপর মুখমণ্ডল মিলানো প্রভৃতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে যখন এই সব কাজের সঙ্গে কবরে-মাজারে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে ডাকা, তার নিকট ফরিয়াদ পেশ এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন সংযুক্ত হয়।

আমি ইতোপূর্বেই এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করেছি এবং সেখানেই কবর সমূহের যিয়ারত উপলক্ষে যে সব শির্কী কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে তার উপর আলোকপাত করেছি। তাতে শরয়ী যিয়ারত এবং বিদআতী যিয়ারতের পার্থক্য নির্দেশ করে শেষোক্ত যিয়ারতে নাসারাদের সঙ্গে গোরপোরস্ত ব্যক্তিদের মিল দেখিয়েছি এবং এটা যে তাদের অন্ধ অনুকরণের ফলশ্রুতি তাও দেখিয়ে দিয়েছি।

পীর এবং বুযুর্গদের সম্মুখে মাথা অবনমিত করা, মাটি চুমা খাওয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই। বরং আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর সামনে শুধু মাথা ঝুকানোও সিদ্ধ নয়। মুসনাদে আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, তিনি সিরিয়া থেকে মাদীনাহ্য় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে সিজদা ক'রে ফেললেন। রসূল ﷺ বললেন, মু'আয! তুমি এ কী কাণ্ড করলে? তখন মু'আয (রাযি.) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে দেখে এলাম যে, তারা তাদের পাদ্রী এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তিদের সিজদা করে থাকে। তারা এই কাজের সমর্থনে বলে যে, এরূপ সিজদা পূর্ববর্তী নাবীদের যুগ থেকে চলে আসছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন- জেনে রাখো, হে মুআয! এটা সত্যের অপলাপ, তাদের এক মিথ্যা ভাষণ। আমি যদি মানুষকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তা হলে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদা করতে বলতাম, কেননা স্ত্রীদের উপর স্বামীদের বড় রকম হক্ রয়েছে। (কিন্তু যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষই অপর কোন মানুষের সিজদা পেতে পারে না। তাই এ ধরনের হুকুম আমি দিতে পারি না।)

তারপর তিনি ﷺ বললেন, হে মুআয! আমার মৃত্যুর পর যখন আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন কি (কবরের উদ্দেশে) সিজদা করবে? মু'আয (রাযি.) বললেন, ''না'। তখন রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, কখনো তা করবে না।

বরং এর চাইতেও বড় হুঁশিয়ারী রয়েছে নিম্নোক্ত ঘটনায়।

সহীহ বুখারীতে জাবির (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুগ্ন অবস্থায় বসে বসে যখন নামায পড়ছিলেন, তখন তাঁর পশ্চাতে সহাবীগণ কাতার বেঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকেও বসে নামায পড়ার হুকুম দিলেন। তারপর ইরশাদ ফরমালেন, অনারবরা যেভাবে একে অপরের তা'যীম করে থাকে, তোমরা আমাকে সেরূপ তাযীম করো না। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তার

সম্মুখে লোকেদের দণ্ডবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশী হয়, সে যেন দোযখে তাঁর বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যখন রসূল ﷺ অনারবদের মধ্যে প্রচলিত বড়দের প্রতি সম্মানার্থে দাঁড়ানোর প্রথাকে এতদূর অপছন্দ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এমন কাজ থেকে এত অধিক পরহেয করেছেন যে, তিনি বসে নামায পড়ানো অবস্থায় তাঁর পশ্চাতে সহাবাগণের দাঁড়িয়ে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়তে বললেন। এটা এজন্য করলেন যে, যারা তাদের বুযুর্গ ও মান্য ব্যক্তিদের সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হয় তাদের অনুকরণ যেন মুসলমানরা না করে। এছাড়া তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকদের দাঁড়ান দেখে খুশী হয়, দোযখে প্রবেশ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এই যদি হয় নিষেধাজ্ঞার পরিসর, তাহলে পীর বুযুর্গদের সিজদা করা, তাদের সামনে মাথা নোয়ানো এবং হাত চুম্বন করা কী করে জায়িয হবে?

'উমার ইবনে আব্দুল আযীয- যিনি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র খলীফা ছিলেন, তিনি এমন সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন যাদের কাজই ছিল দরবারে প্রবেশকারীদের মাটি চুম্বন দেয়ার প্রথা পালনে বাধা দেয়া। সে সত্ত্বেও যারা সেরূপ করতো তাদের তারা শায়েস্তা করতেন।

মোট কথা, কিয়াম (দাঁড়ান) ক'উদ (বসা), রুকু এবং সিজদা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আসমান ও যমীনের স্রষ্টা একক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য- তাঁরই খাস অধিকার। আর যে বস্তুতে একমাত্র আল্লাহ্‌রই হক- সেখানে অন্য কারোর বিন্দুমাত্রও অংশ নেই।

এমনকি শপথ করার মত একটি চিরাভ্যস্ত কাজ যা মানুষ অহরহ করে থাকে-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নামেই করা চলবে না। অন্য কারোও নামে কসম খাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

বুখারী এবং মুসলিমের রিওয়ায়াতে আছে- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت-

"যে ব্যক্তি শপথ করবে- সে যেন শপথ করে আল্লাহ্‌র নামে নতুবা সে নীরব থাকবে, অন্য কোন শপথই উচ্চারণ করবে না।"

অন্য হাদীসে আছে ঃ

من حلف لغير الله فقد اشرك–

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন নামে কসম খায়, সে শির্ক করে থাকে।"

বস্তুতঃ সব রকম ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সুনির্দিষ্ট, একমাত্র লা শরীক আল্লাহরই তা প্রাপ্য, অন্য কারোর কোনই হক নেই তাতে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينه : ٥)

"বস্তুতঃ তাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে তারা খালেস করে নিবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য-একনিষ্ঠভাবে এবং কায়িম করবে নামাযকে এবং প্রদান করতে থাকবে যাকাত আর প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্মমত।" (সূরা বাইয়িনাহ ৫)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বস্তু পছন্দ করেন, সেগুলো এই ঃ

(١) أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

১। "তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো আর ইবাদাতে কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করো না।"

(٢) أَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

২। "সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রশিকে (কুরআন এবং তার ব্যাখ্যারূপী সুন্নাহ্‌কে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে আর তোমরা ফির্কায় ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যেয়ো না।"

(٣) وَأَنْ تَنَا صَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ اَمْرَكُمْ.

৩। "আর আল্লাহ যাকে তোমাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে (তার অমঙ্গল কামনা করবে না, বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে যাবে না)।"

এ কথা সুবিদিত যে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করে দেয়াই ইবাদাতের তথা আনুগত্যের মূল কথা। এ জন্য রসূল ﷺ প্রকাশ্য, গোপন, ছোট, বড় সব রকম শির্ক ও শির্কী কাজে জড়িত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি বহু সূত্রে বর্ণিত (মুতাওয়াতির) হাদীসে বিভিন্ন শব্দে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময়ে নামায পড়তে (সিজদা করতে) তিনি নিষেধ করেছেন।

কখনও তিনি বলেছেন ঃ

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها-

"সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা ইচ্ছা করে নামায পড়ো না. আবার কখনও বা তিনি ফজরের উদয় (ফজরের নামায পড়া) এর পর থেকে সূর্য পুরাপুরি না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য পূরাপুরি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"

আবার কখনও বা একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে,

ان الشمس اذا طلعت طلعت بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار.

"নিশ্চয় সূর্য যখন উদিত হয়-তখন শয়তানের দুই শিং এর মধ্যস্থল দিয়ে উদিত হয়। আর সেই সময় কাফিরেরা সূর্যকে সিজদা করে থাকে।"

এই সময় নামায আদায় করতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, তাতে করে মুশরিকদের সঙ্গে সময়ের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য দেখা দেয়। কেননা তারা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে সিজদা করে থাকে আর সে সময় শয়তান সূর্যের নিকটে অবস্থান করে- যাতে করে মানুষের সিজদা তার জন্য হয়ে যায়।

মুশরিকদের সঙ্গে এতটুকু সামঞ্জস্যের ব্যাপারকেও যখন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে তখন মুশরিকদের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারে সামঞ্জস্য রেখে অথবা তাদের দেখাদেখি শির্ক ও শির্কীয়ানা কাজে জড়িত হয়ে পড়া কত বড় অপরাধ তা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

রসূলুল্লাহ ﷺ কে আহলে কিতাবদের উদ্দেশে যে কথা ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (ال عمران : ٦٤)

"বলুন (হে রসূল!) হে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী, নাসারাগণ) তোমরা আসো এমন এক কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একই (অর্থাৎ যা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম রূপে ব্যবহৃত হতে পারে) আর সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই ইবাদাত করব না-কারোরই আনুগত্য বরণ করব না, তার সঙ্গে অপর কাউকে শরীক করবে না এবং আমাদের কেউই আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেই রবরূপে গ্রহণ করব না। তারা যদি এই ব্যাপারে বিমুখ হয় (রাজী না হয় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে বলুন ঃ তোমরা এই বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা হচ্ছি মুসলমান-একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণকারী।" (সূরা আলু ইমরান ৬৪)

এই সম্বোধন এজন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে প্রভুরূপে মেনে নেয়ার ব্যাপারে উভয়ের (ইয়াহুদী ও নাসারাগণের) মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। আর আমরা মুসলমানগণ এ ধরনের কাজে লিপ্ত হতে কঠোর নিষেধ বাণী পেয়েছি, কাজেই যারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর হিদায়াত বা সহাবাগণের অনুসৃত পথ এবং তাবিয়ীদের অবলম্বিত পন্থা (রিয্ওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন) ছেড়ে নাসারা এবং ইয়াহুদীদের তরীকাকে অবলম্বন এবং তাদের পথের অনুসরণকে প্রেয় ও শ্রেয় মনে করে বেছে নেয়, তারা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর এবং তাঁর রসূল

ﷺ এর হুকুম আহকাম হেলায় প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এটা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ এর জঘন্য নাফরমানি।

কতক লোক এমন রয়েছে যারা বলে, "আল্লাহর বারকাতে এবং আপনার কল্যাণে আমার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে"। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের কথা শরী'আতের সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা কার্যে সিদ্ধিদানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কেউ শরীক হতে পারে না।

এ ব্যাপারেও রসূলুল্লাহ ﷺ এর পথ নির্দেশ সুস্পষ্ট। যখন কোন এক ব্যক্তি কোন এক প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

ما شاء الله وشئت.

"আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।"

তখন এ কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন,

اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده.

"কী! তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়ে দিলে? এরূপ না বলে তুমি বরং বল, একমাত্র আল্লাহ এককভাবে যা ইচ্ছা করেন।"

অন্যত্র তিনি তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন,

لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.

"এ কথা বলো না যে, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা ইচ্ছা করেন, বরং বলো ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তৎপর (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মুতাবেক) মুহাম্মাদ ﷺ যা যা ইচ্ছা করেন।"

এক হাদীসে বলা হয়েছে, কোন এক ব্যক্তি মুসলমানদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক না বানাতে তবে তোমরা কত সুন্দর জাতিই না হতে। কিন্তু তোমরা বলে থাকো ঃ

ما شاء الله وشاء محمد.

"যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং যা মুহাম্মাদ ﷺ ইচ্ছা করেন।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতে নিষেধ করে দিলেন।

সহীহ বুখারীতে যায়িদ ইবনে খালিদ (রাযি.) থেকে রিওয়ায়াত এসেছে ঃ

قال صلى لنا رسول الله صلعم صلاة الفجر با لحديبية فى اثر سماء من الليل فقال اتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله اعلم، قال اصبح من عبادى مؤمن بى، كافر بالكواكب ومومن بالكواكب كافر بى، فاما من قال مطرذا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذالك كافر بى مو من بالكواكب.

নাবী ﷺ হুদায়বিয়ায় আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, ঐ রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নামাযের পর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জান যে, গত রাত্রে তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই উত্তম জানেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ "আজকের রাত্রে আমার বান্দাদের মধ্যে কতক আমার প্রতি ঈমান রাখে আর নক্ষত্র (পরস্তী)-কে অস্বীকার করে, আবার কতক এমন রয়েছে যারা নক্ষত্রের প্রতিই ঈমান রাখে এবং আমাকে ইনকার করে- অর্থাৎ আমার কুদরতী শক্তিকে অস্বীকার করে। (তারপর আল্লাহ বলেন) যারা (মনে দৃঢ় আস্থা রেখে) বলে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং দয়াতেই বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি (প্রকৃত প্রস্তাবে) ঈমান রাখে এবং নক্ষত্র পূজা থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখে। আর যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র রাশির যোগাযোগের ফলে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার উপর অনাস্থা প্রকাশ করে এবং নক্ষত্রের উপরই ঈমান রাখে।"

অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, প্রকৃতির রাজ্যে আল্লাহ তা'আলা যে সব কার্য-কারণ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চালু রেখেছেন সে গুলো সবই তাঁর হুকুমবরদার, তাঁর ইচ্ছা এবং ইঙ্গিতেই সব কিছু ঘটে থাকে, ওগুলোর কোনটিকেই তাঁর শরীক ও সাহায্যকারীরূপে মনে করা যাবে না। যারা বলে থাকে, "অমুক কাজটি অমুক বুযুর্গের বারকাতে সম্পন্ন হয়েছে"-তাদের এই কথার তাৎপর্য কয়েক রকম হতে

পারে। প্রথম, এর অর্থ দু'আ হতে পারে, এই তাৎপর্য গ্রহণ মোটেই আপত্তিকর নয়। বুযুর্গ ব্যক্তিদের দু'আ আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয়ে থাকে, বিশেষ করে এক অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য খুব দ্রুত ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়, এর অর্থ হয় ঃ বুযর্গ ব্যক্তির সাহচর্যে ইলমী ও 'আমলী কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। এই অর্থও বাস্তব ও সত্য। জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান সৎ কর্মশীল বুযুর্গ ও ব্যক্তির সাহচর্যে যারা আসেন সেই জ্ঞানবৃদ্ধ, উন্নত-চরিত্র ও অমলিন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভূত কল্যাণ লাভ করে থাকেন। এগুলো এবং এই ধরনের অন্য কোন অর্থ হলে তাও হবে বিশুদ্ধ -দোষ বিবর্জিত। এতে আপত্তির কোন কারণ নেই।

তৃতীয়, যখন বারকাত হাসেল থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, মৃত বা অনুপস্থিত বুযুর্গের নিকট আবেদন নিবেদন পেশ করে কল্যাণ লাভ করা যায়, তখন সে অর্থ হবে বাতিল, অন্যায় ও অমূলক। কারণ সে অবস্থায় মৃত সেই অক্ষম। কারণ তখন তার দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়, কোন রূপ প্রভাব বিস্তারে তার কোনই ক্ষমতা নেই। অথবা যখন উদ্দেশ্য হয় নাজারিয বিদ'আতী কোন কাজ, তখন বুযুর্গ ব্যক্তি ঐ আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেন না দিতে পারেন না। এ ধরনের অন্য তাৎপর্যও বাতিল। তবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য বরণের জন্য সুন্নত-সম্মত কোন বাস্তব আমল এবং মুমিনদের একের জন্য অপরের দু'আ করা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকের জন্য কল্যাণপ্রদ এবং এই কল্যাণ লাভ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভরশীল।

কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং তার নিরসন

ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী তার প্রশ্নে কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে যে কথা জানতে চেয়েছেন তার জওয়াব হচ্ছে এই ঃ

এই ব্যাপারে লোকদের মধ্যে অনেক দলই- গাউস, কুতুব এর অস্তিত্বের সমর্থক, তারা তাদের বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ বাতিল, দ্বীন

ইসলাম তথা ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসে-সহীহায় তার কোনই সমর্থন মিলে না।

দৃষ্টান্ত পেশ করছি। কতক লোকে এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, গাউস এমন এক সত্তা যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবসমূহের রিযক অর্থাৎ জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে আর তাদের সাহায্যেই দুশমনের বিরুদ্ধে সহায়তা অর্জিত হয়ে থাকে! এমন কি উর্ধ্ব লোকের ফেরেশতা এবং পানির গর্ভে সঞ্চারমান মৎস্যসমূহও তার ওয়াসীলাতেই সাহায্য লাভ করে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা এমন এক কথা যা নাসারাগণ ঈসা ('আ.) সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে আর রাফিযীরা (গালিয়াগণ) আলী (রাযি.) সম্বন্ধে এ ধরনের ই'তিকাদ পোষণ করে। আর এ হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফর। যারা এ রকম গুমরাহীর কথা বলবে তাদেরকে বলতে হবে, তাওবাহ কর। যদি তাওবাহ করে, ভাল। কিন্তু জীব সমূহের মধ্যে এমন কেউ নেই- না ফেরেশেতাদের মধ্যে, না কোন মানুষের মধ্যে- যার ওয়াসীলায় আল্লাহ্র কোন সৃষ্ট জীবের সাহায্য লাভ হয়ে থাকে। এ ধরনের কথা মুসলমানদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে কুফরের পর্যায়ভুক্ত।

কতক লোক বলে থাকে যে, পৃথিবীতে ৩১০ জনের কিছু বেশী এমন সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে যাদেরকে বলা হয় নুজাবা (নজীব)।

এদের মধ্যে বেছে ৭০ জনকে নির্বাচিত করা হয় যাদেরকে বল হয় নূকাবা (নকীব)। এই ৭০ জনের মধ্যে রয়েছেন ৪০ জন এমন পুরুষ যাদের বলা হয় আবদাল, আবার তাদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন আকতাব (কুতুব) এই ৭ জনের মধ্যে আছেন ৪ জন যাদের বলা হয় আওতাদ, অতঃপর ঐ চার জনের মধ্যে আছেন এক ব্যক্তি সত্তা যার নাম গাউস- তিনি অবস্থান করেন মাক্কাহ মুয়ায্যমায়। দুনিয়ার বাসিন্দাদের উপর যখন খাদ্য অথবা অন্য কোন ব্যাপারে কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয়ে যায়, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিপদ নিরসনের জন্য প্রথমোল্লেখিত নূজাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় যাদের সংখ্যা ১৩০ জন এর কিছু উপরে। অতঃপর নূজাবাগণ ৭০ জন নূকাবার দিকে, সেই ৭০ জন নূকাবা ৪০ জন আবদালের দিকে, তারা আবার ৭ জন আকতাবের

নিকট তারা পুনঃ ৪ জন আওতাদের নিকট এবং সর্বশেষে তারা তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তি-সত্তা গাউসের দিকে ধাবিত হয়।

কতক লোক উল্লেখিত সংখ্যা, নাম এবং পদমর্যাদার মধ্যে কিছু কমবেশী ও পার্থক্য করে থাকে। কেননা তাদের সম্বন্ধে বহু রকম উক্তি শুনতে পাওয়া যায়। বহু অদ্ভুত এবং উদ্ভট কথাও তাদের সম্বন্ধে প্রচারিত হয়ে থাকে। কেউ বলে, গাউস এবং যুগের খিযর ('আ.)-এর নামে আসমান থেকে মাক্কাহ মুয়ায্যমায় একটা সবুজ পত্র অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ ধারণা ঐ সব লোক পোষণ করে থাকে যাদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, খিযর বেলায়েতের একটি পর্যায়। তাদের মতে প্রত্যেক যুগে একজন করে খিযর থাকেন। খিযর সম্বন্ধে তাদের দু' রকম কথা শুনতে পাওয়া যায় আর এগুলো সমস্তই বাতিল, প্রত্যাখ্যাত এবং অযোগ্য। কেননা, আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মাজীদে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। সালফে- সালিহীনের মধ্যে কেউ এ ধরনের কথা বলে যাননি। এ ধরনের কোন কথা না বলেছেন শরী'আতের কোন ইমাম, না পূর্ব যুগের মা'রেফতের কোন বড় মাশায়েখ।

আর এ কথা কে না জানে যে, সৃষ্ট জীব তথা মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সত্তা সেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এবং তার শ্রেষ্ঠ চার শিষ্য সিদ্দীকে আকবর, ফারূকে আযম, উসমান যুন নূরাইন এবং আমীরুল মুমিনীন আলী (রাযি.) ছিলেন নাবীদের পর মর্যাদার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এঁরা সবাই মাক্কাহ ছেড়ে মাদীনাহ্য় অবস্থান করে গেছেন। এঁদের মধ্যে কেউই (হিজরতের পর থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত) মাক্কাহ্য় বসবাস করেননি।

কেউ কেউ মুগীরা ইবনে শু'বার গোলাম হেলাল সম্বন্ধে বলে থাকে যে, তিনি সাতজন কুতুবের এক ছিলেন তারা এর সমর্থনে একটা 'হাদীসও' পেশ করে থাকে। কিন্তু সেই 'হাদীসটি' হাদীস-শাস্ত্র বিশারদদের সর্বসম্মত মতে বাতিল।

এ ধরনের কতিপয় হাদীস যদিও আবূ নায়ীম (রহ.) হিলিয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে এবং শাইখ আবূ আবদুর রহমান আসসালমা তার কোন কোন গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন, তার দ্বারা ধোঁকায় পড়া এবং নিজেদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা

উচিত নয়। কেননা, তাদের এসব সঙ্কলিত গ্রন্থে একদিকে যেমন সহীহ এবং হাসান হাদীস সঙ্কলিত হয়েছে- তেমনি তাতে যঈফ, মাউযূ এবং মিথ্যা হাদীসও স্থান পেয়েছে– যেগুলোর প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্বন্ধে হাদীসাভিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই।

হাদীস সংকলকগণের মধ্যে কেউ কেউ যেরূপ রিওয়ায়াত শ্রবণ করেছেন, ঠিক সেরূপই লিপিবদ্ধ করেছেন- তারা কোন্ রিওয়ায়াত সহীহ, কোন্‌টি বাতিল সে সব বিচার বিবেচনা করার ও পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। অপরপক্ষে সত্যনিষ্ঠ আহলে হাদীসগণ তথা মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণ কখনই এরূপ করতেন না। তারা হাদীস পরীক্ষা করে দেখতেন এবং তাদের বিচারে যেগুলো মওযূ-জাল এবং বাতিল বলে সাব্যস্ত হত তারা রিওয়ায়াত করতেন না। কারণ তারা সহীহ বুখারীতে রসূল ﷺ এর এই হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন যাতে বলা হয়েছে ঃ

من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين.

"যে ব্যক্তি এমন এক হাদীস রিওয়ায়াত করে যে হাদীস সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, তা মিথ্যা, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।"

মোট কথা, প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, বাঞ্ছিত কোন বস্তুর জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আবেদন জানাতে হয় অথবা আসমানী কোন বালা মুসীবত যখন নাযিল হয়, তখনই সেই ভয় ও বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে নিবেদন পেশ করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বৃষ্টির যখন একান্ত প্রয়োজন তখন বৃষ্টি না হলে তারা ইসতিস্‌কার নামায পড়ে (সময়মত শস্য উৎপাদনের জন্য) পানি বর্ষণের প্রার্থনা জানায়। আর চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, সাইক্লোন, ভূমিকম্প কুজঝটিকায় (অথবা ট্রেন, বাস, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতির দুর্ঘটনায়) বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য মুসলমান একমাত্র একক লা-শারীক আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়ে থাকে। তাঁকেই তারা একমাত্র বিপত্তারণ বলে বিশ্বাস করে। জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রেখে তাঁকেই আকুল হৃদয়ে কাতর স্বরে ডাকতে থাকে। তখন তারা অপর কাউকেই আল্লাহ্‌র শরীক ভাবে না। বিপদ মুক্তির জন্য তাঁর সঙ্গে অপর কাউকেই তারা ডাকে না।

আর প্রকৃত কথা এই যে, কোন মুসলিমের জন্য এটা সিদ্ধ নয় যে, নিজের কোন অভাব মিটান ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে মাধ্যম রূপে পাওয়ার নিমিত্ত এদিক সেদিক ধন্না দেয়। তার পক্ষে এটাও মোটেই কাম্য নয় যে, ইসলাম গ্রহণ ও তাওহীদ বরণের পর এ ধারণা পোষণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছাড়া (কুরআন ও হাদীসে যার কোনই দলীল নেই) তাদের দু'আ কবুল হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ﴾ (يونس : ١٢)

"যখন মানুষের উপর কোন ক্ষতিকর কিছু আপতিত হয়, তখন সে শায়িত, উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় আমার নিকট আহবান জানায়, (কিন্তু) যখন আমি তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুটি অপসারিত করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুর আপসারণের জন্য আমার নিকট কোন আহ্বানই সে জানায়নি।" (সূরা ইউনুস ১২)

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (بني إسرائيل ٦٧)

"যখন সমুদ্রে তোমাদেরকে কোন বিপদাপদ স্পর্শ করে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া যাদেরকে ডেকে থাকো তারা সবাই তখন হারিয়ে যায়।"
(সূরা বানী ইসরাঈল ৬৭)

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام : ٤٠)

"(হে রসূল) আপনি বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখ-দেখি তোমাদের উপর আল্লাহর কোন শাস্তি যদি আপতিত হয় অথবা তোমাদের নিকট যদি 'কিয়ামাত'

উপস্থিত হয়ে যায়, তখন কি তোমরা সাহায্যের জন্য আহবান করবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে? (উত্তর দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। না, বরং তোমরা আহবান করবে তাঁকেই, তিনি ইচ্ছা করলেই তোমাদের সে আপদ যা মোচনের জন্য তোমরা তাঁকে আহবান জানিয়েছিলে দূর করে দেবেন আর যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে, তাদের তোমরা ভুলে যাবে।"

(সূরা আল-আন'আম ৪০-৪১)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام : ٤٢-٤٣)

"নিশ্চয় আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর (তাদের কর্মফলের জন্য) আমি তাদেরকে অর্থ সঙ্কট ও আপদ দ্বারা বিপন্ন করেছি- যাতে তারা আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়নম্র হয়। কিন্তু আমার পরীক্ষা যখন এসে গেল তাদের নিকটে তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের অন্তরগুলো আরও কঠোর হল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল।" (সূরা আল-আন'আম ৪২-৪৩)

রসূল ﷺ সহাবাদের কল্যাণার্থে ইসতিস্‌কার (পানি বর্ষণের প্রার্থনা জানিয়ে) দু'আ করতেন। এই দু'আ তিনি করতেন কখনও নামায পড়ে আর কখনও নামায না পড়েও। ইসতিস্‌কার নামাযে আর সলাতে কুসূফে (সূর্য গ্রহণের সময় পঠিত নামায) তিনি নিজে ইমামাত করেছেন। এছাড়া মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তিনি নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। এভাবে তার ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীন, মুজতাহিদীন, মাশায়েখে কুবরা অর্থাৎ বড় বড় সাধকদের মধ্যে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল এবং তারা সব সময় এভাবেই আমল করে গিয়েছেন।

এ জন্যই বলা হয়েছেন যে, তিনটি (বদ্ধমূল) ধারণায় কোনই ভিত্তি নেই- ১। বাবে নাসিরিয়া ২। মুনতাযরে রাওয়াফেয এবং ৩। গাউসে জাঁহা।

যিয়ারাতুল কুবূর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

নাসিরিয়া ফির্কা এই দাবী জানিয়ে আসছে যে, বাব আছে এবং তারই উপর বিশ্বজগৎ কায়িম রয়েছে।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সত্তা তো মওজুদ রয়েছে কিন্তু এ সম্পর্কে নাসিরিয়াদের উক্ত সত্তা সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ বাতিল।

আর মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (রহ.) হচ্ছেন আল মুনতাযর। আর মাক্কাহয় অবস্থানরত অদৃশ্য গাউস প্রভৃতি এমন ধরনের মিথ্যা যার মূলে সত্যের লেশমাত্রও নেই। এমনিভাবে যারা দাবী করে থাকে যে, কুতুব, গাউস এমন সুবিজ্ঞ সত্তা যারা বিশ্বের সর্বত্র অবস্থিত আউলিয়াদের চিনেন এবং তাদের সাহায্যও করে থাকেন, তাদের এ দাবীও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা স্বয়ং আবূ বাকর সিদ্দীক এবং 'উমার ফারূক (রাযি.)-এর ন্যায় বুযুর্গ সাধকও তামাম আউলিয়াকে জানতেন না, চিনতেন না, তাদের সাহায্যও করতেন না।

তার চাইতেও যুক্তি নির্ভর কথা এই যে, রসূল ﷺ যিনি ছিলেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর সরদার, সেই মহা মানব ও মহা নাবী ﷺ তার উম্মতদের মধ্যে যাদেরকে এই দুনিয়ায় দেখেননি-দেখার সুযোগ পাননি, তাদেরকে তিনি কিয়ামাত দিবসে এমনিতেই চিনতে পারবেন না, চিনতে পারবেন কেবল তাদের ওযুর চিহ্ন দেখে। এই-ই যখন সাইয়িদুল মুরসালীন-সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীর অবস্থা, তখন অন্যদের ব্যাপারে ঐ সব সত্য বিকৃতিকারী, মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্টদের ধারণা কী করে সঠিক ও দুরস্ত হতে পারে?

আর আল্লাহর ওলী আউলিয়াদের সংখ্যা এত অগণিত যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ সে সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়। ওলী আউলিয়া তো পরের কথা, খোদ নাবী ও রসূলদের সকলকে তো নয়ই, অধিকাংশকেও স্বয়ং রসূল ﷺ জানতেন না, অথচ তিনি হচ্ছেন তাদের সকলের নেতা এবং তাদের মুখপাত্র।

আল্লাহ স্বয়ং কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (مومن : ٧٨)

"(হে রসূল!) আমি নিশ্চয় আপনার পূর্বে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কতকের কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, কতকের (অধিকাংশের) কথা আপনার নিকট উল্লেখ করিনি।" (সূরা মুমিন ৭৮)

এরপর আরও দেখা যায় মূসা ('আ.) এর মত জবরদস্ত রসূল খিযর ('আ.) এর ন্যায় অনন্য ওলীউল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন আর খিযর ('আ.) ও মূসা ('আ.)-কে চিনতেন না। নিগূঢ় জ্ঞানের অধিকারী খিযর ('আ.) সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবহিত হয়ে সূসা ('আ.) যখন তার সন্ধানে বের হলেন এবং সাক্ষাৎ লাভের পর তাকে সালাম জানালেন, তখন সেই সালামের শব্দ শুনে বিস্ময়াবিষ্ট খিযর ('আ.) বিস্ময়ের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন; এখানে সালাম শব্দ উচ্চারিত হলো কেমন করে, কার মুখ দিয়ে? তখন মূসা ('আ.) বললেন, আমারই মুখ দিয়ে আর আমি হচ্ছি মূসা! তখন খিযর ('আ.) বললেন, কোন্ মূসা, বানী ইসরাঈলের মূসা?

জওয়াবে মূসা ('আ.) বললেন, হাঁ আমি সেই মূসাই বটে? ইতোপূর্বে তার নাম তাকে জানান হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি তাকে দেখার (অথবা তার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানার) সুযোগ পাননি।

খিযর ('আ.) জীবিত নেই, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মারা গিয়েছেন

যে সব লোক মনে করে যে, খিযর ('আ.) হচ্ছেন সকল ওলী আউলিয়ার নকীব এবং তাদের সকলের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকেফহাল, তাদের ধারণা সবই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। প্রকৃত সত্য তা-ই যা তত্ত্ববিদ-মুহাক্কিকগণ তার সম্বন্ধে বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, "ইসলামের পূর্ব যুগেই অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ এর আবির্ভাবের পূর্বেই খিযর ('আ.) ইন্তিকাল করেছেন।"

তিনি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনতেন, তাঁকে মেনে চলতেন এবং তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হতেন। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সমসাময়িক এবং

পরবর্তী সকল জগৎবাসীর জন্য তাঁর আনুগত্য বরণ আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন।

এছাড়া ঐ সময়ে কাফিরদের মধ্যে অবস্থান করে পানিতে বিপন্ন নৌকা প্রভৃতি রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার চাইতে তার পক্ষে রসূল ﷺ এর সাহচর্যে মাক্কাহ্য় ও মাদীনাহ্য় অবস্থিতি, সহাবীদের সঙ্গে মিলে জিহাদে অংশ গ্রহণ এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান অধিকতর বাঞ্ছনীয় হ'ত।

এরপরও প্রশ্ন করা যেতে পারে, (সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীর মাধ্যমে দীন মুকাম্মল হওয়ার পর) মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে এবং পার্থিব বিষয়ে তার প্রয়োজনটাই বা কী? দ্বীনের সব কিছুই তো আখিরী নাবী ﷺ এর মাধ্যমে সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নাবী ﷺ কিতাব এবং হিকমাত তথা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দ্বীন দুনিয়ার সব বিষয়ে পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন-তাঁকে ছাড়া আর কারোরই অনুসরণ করা চলবে না, এমনকি আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী (কালীমুল্লাহ) ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রসূল মূসা ('আ.)-এরও নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ-

"মূসা ('আ.) যদি এই সময় জীবিত থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে।"

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ এর আবির্ভাবের পর নবুওত ও রিসালাতের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। অন্য কারও আবির্ভাব ঘটলে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এজন্যই যখন ঈসা ('আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণ ঘটবে, তখন তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মাজীদ এবং তাঁর ﷺ সুন্নাত মুতাবিক হুকুম আহকাম জারী এবং বিচারাদি নিষ্পন্ন করবেন। অতএব সেই রহমাতে আলম বিশ্ব কল্যাণের মূর্ত প্রতীকের নবুওত জারী থাকতে খিযর ('আ.) বা অন্য কারোর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

এছাড়া রসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে ঈসা ('আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণের সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

كيف تهلك امة انا او لها وعيسى فى اخرها.

"সেই উম্মত কী করে ধ্বংস হতে পারে যার সূচনায় রয়েছি আমি আর শেষে থাকবেন ঈসা ('আ.)।" সুতরাং এই দুই বুযুর্গ নাবী যারা ইব্রাহীম ('আ.), মূসা ('আ.) এবং নূহ ('আ.) এর ন্যায় দৃঢ়-সঙ্কল্প ও মহত্তম রসূল রূপে পরিচিত তারা এবং বিশেষ করে আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মুহাম্মাদ রসূল ﷺ নিজেকে যখন উম্মাতের সাধারণ জনবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সময়েই গোপনীয়তা এখতিয়ার করেননি, তখন যিনি কোন ক্রমেই তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না সেই খিযর ('আ.) কী করে অদৃশ্য রহস্যে আবৃত থাকতে পারেন?

খিযর ('আ.) যদি সত্য সত্যই (কিয়ামাত অবধি) চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ কেন তা কস্মিনকালে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করলেন না? কেন তিনি প্রকাশ্যে উম্মতকে তা বলে গেলেন না? খুলাফায়ে রাশিদীনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত করলেন না?

তারপর যারা বলে থাকে, খিযর ('আ.) হচ্ছেন ওলী আউলিয়াদের নকীব তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তাকে নকীব নির্বাচন করল কে? সত্য কথা এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহাবীগণই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম আউলিয়া আর খিযর ('আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, খিযর ('আ.) সম্পর্কে যত রকম বৃত্তান্ত এবং কাহিনী পেশ করা হয়েছে তার কতক মিথ্যা ও কপোলকল্পিত। হয়ত কোন সময় কোন এক ব্যক্তি আচানক কাউকে দূর থেকে দেখল, তখন সে ধারণা করে নিল যে, তার দেখা লোকটি খিযর ('আ.) না হয়ে যায় না।

অতঃপর সে লোকেদের মধ্যে প্রচার করে দিল যে, খিযর ('আ.)-কে সে স্বচক্ষে দেখেছে। এমনিভাবে কখনও কেউ কাউকে দেখে ধরে নিল যে, সে নিষ্পাপ মুনতাযর ইমামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। যার আবির্ভাবের

আশায় রাফিজীরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষারত-তিনি আবির্ভূত হয়ে গেছেন। তারপর সে এই কথা প্রচারে লেগে গেল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তাকে খিযর ('আ.) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতো, তখন তিনি তার জওয়াবে বলতেন, যে ব্যক্তি তোমাকে এরূপ গায়িবী খবর শুনিয়েছে সে তোমার প্রতি সুবিচার করেনি। এ সবই হচ্ছে শয়তানী ওয়াসওয়াসা। মানুষের মুখে খিযর সম্পর্কে এসব আজগুবী কাহিনী যে জারী করে দিয়েছে সে শয়তান ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে আমি (ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ) অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কেউ কেউ বলেন, 'কুতুব' আর 'গাউস' হচ্ছেন 'ফর্দে জামে'। এই 'ফর্দে জামে' এর অর্থ যদি এই হয় যে, উম্মাতের মধ্যে (প্রতি যুগে) এমন এক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব থাকে যিনি যুগের সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহলে সেটা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তো সম্ভব যে, ঐ এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি এক না হয়ে দু'জনও হতে পারেন, তিনজনও হতে পারেন এবং চারজনও হতে পারেন যারা জ্ঞানে গুণে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে একে অপরের সমান। অথবা এও হতে পারে যে, এক যুগে সমসাময়িক কালে বহু বিশিষ্ট লোকের এমন সমাবেশ ঘটে গেছে যাদের একেক জন একেক গুণ বৈশিষ্ট্যে অপর জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো মানের দিক দিয়ে হয়ত প্রায় সমান সমান কিংবা কাছাকাছি।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, কোন যুগে কোন অবস্থায় যদি এক ব্যক্তি সেই যুগের সকল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হয়, তাহলে তাকে 'কুতুব' ও 'গাউসে জামে' রূপে আখ্যায়িত করতে হবে-এমন কোন কথা নেই। এরূপ আখ্যায়ন সরাসরি বিদ'আত-এক নবাবিষ্কৃত কাজ। আল্লাহ্‌র কিতাবে এর কোনই প্রমাণ নেই। সলফে সালিহীনের মধ্যে কেউ কিংবা ইমামগণের মধ্যে কোন একজন তাদের মুখ দিয়ে এ ধরনের কোন কথা উচ্চারণ করেননি। তবে প্রাথমিক যুগে কোন কোন লোক সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করা হতো যে, তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। (এরূপ ধারণা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রতিটি দেশে প্রতি

যুগে এরূপ ধারণা ও মূল্যায়নের নিয়ম চলে আসছে-অনুবাদক) কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত ধারণার পর্যায়েই সীমিত থাকত। সমষ্টিগতভাবে কাউকে শ্রেষ্ঠত্বের লেবেল লাগিয়ে সুনির্দিষ্ট করা হত না অর্থাৎ ব্যক্তিগত দলগত বিশ্বাসের পর্যায়ে রূপান্তরিত করা হত না!

এ কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, যারা কোন একজনকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে তার উপর ঈমান রাখতো, তাদের মধ্যে কতক জন দাবী করতো যে, কুতুব আকতাবের সিলসিলা ইমাম হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাযি.) থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী যুগের মাশায়েখ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে। এই যে ধারণা- এটা আহলে সুন্নাত মাযহাব অনুসারে তো সহীহ নয়-ই এমনকি রাফিযী (শিয়া) মতেও নয়। এই মত অনুসারে শ্রেষ্ঠতম সাধক বা কুতুবের আসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হননি সাধক চূড়ামণি আবু বাক্‌র, তাপস শ্রেষ্ঠ 'উমার ফারুক, উসমান যুন্ নূরাইন আর আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব! আনসার ও মুহাজিরীনের মধ্যে কুরআনে প্রশংসিত সাবেকুনাল্ আওওয়ালুন-যুগের অগ্রবর্তী দলের তো কোন কথাই নেই। অথচ সেই মহান বুযুর্গ ব্যক্তিত্বগুলোকে বাদ রেখে প্রথম কুতুবরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে হাসান (রাযি.)-কে যিনি রসূল ﷺ এর মহাপ্রয়াণের সময় ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা অর্জনের এবং বালেগ পদবাচ্য হওয়ার মত বয়সে কোন রকমে কেবল পৌঁছেছিলেন।

উপরিউক্ত মতের পরিপোষক বড় বড় কতিপয় মাশায়েখের উক্তি আমার নিকট পৌঁছানো হয়েছে, যাতে তারা বলেছেন, কুতুব ফর্দে জামে'র মর্যাদায় যিনি অভিষিক্ত, তার জ্ঞান মার্গ এতটা ঊর্ধ্বে পৌঁছে যায় যে, তা আল্লাহর কুদরতের সমপর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে আল্লাহ যা জানেন তিনিও তা জানতে পারেন, আল্লাহ যে ক্ষমতা রাখেন তিনিও সেই ক্ষমতার অধিকারী হন। (নাউযুবিল্লাহ্) তাদের মতে নাবী ﷺ এই জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে হস্তান্তরিত হয়ে উক্ত গুণ হাসান (রাযি.)-এর নিকট পৌঁছে যায়, আবার হাসান থেকে হস্তান্তরিত হয়ে পরবর্তী কুতুবের নিকট পৌঁছে। এভাবে উক্ত গুণ হস্তান্তরিত হতে হতে সমসাময়িক কুতুবের অধিকারে এসেছে। আমি এর

জওয়াবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি যে, এই আকীদা স্পষ্ট কুফ্‌র এবং জঘন্য মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমান ঃ নূহ (আ.) তার কওমকে বলেন ঃ

﴿قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ﴾

"আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারসমূহ আর (এ কথাও বলি না যে,) আমার কাছে গায়িবের সংবাদ আছে এবং আমি এটাও বলি না যে, আমি (অতি মানুষ) ফেরেশতা বিশেষ।"
(সূরা হূদ ৩১)

রসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছেন,

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ (اعراف : ١٨٨)

"বলে দাও (হে রসূল!) আমি নিজেও তো নিজের জন্য মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই ঘটবে। আর দেখ! আমি যদি গায়িবের খবর জানতে পারতাম, তাহলে তো প্রভূত কল্যাণ হাসিল করে নিতাম, পক্ষান্তরে কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আল আরাফ ১৮৮)

﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ (ال عمران : ١٥٤)

"তারা বলে থাকে, আমাদের যদি এ ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার থাকতো তা হলে আমাদেরকে (এখানে) এসে নিহত হতে হত না।" (সূরা আলু ইমরান ১৫৪)

﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (العمران : ١٥٤)

"তারা বলে, এ ব্যাপারে আমাদেরও কি কিছু এখতিয়ার আছে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, এখতিয়ারের সবটারই মালিক-মুখতার হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।" (সূরা আলু ইমরান ১৫৪)

﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (ال عمران : ١٢٧-١٢٨)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ এজন্য তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন-যাতে করে তিনি বিধ্বস্ত করে দিবেন কাফিরদের একটা অংশকে অথবা এমনভাবে হতমান করে দেবেন যে, তার ফলে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে সর্বনাশগ্রস্ত অবস্থায়।"

"(হে রসূল!) এ ব্যাপারে কোনও ইখতিয়ার আপনার নাই, হয়ত তিনি তাদের ক্ষমা করে দিবেন, হয়ত বা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, কারণ তারা হচ্ছে জালিম।" (সূরা আলু ইমরান ১২৭-১২৮)

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

(قصص : ٥٦)

"(হে রসূল!) আপনি তাকে সৎ পথে আনতে পারেন না যাকে আপনি আনতে চান, বস্তুতঃ আল্লাহ্ই সৎ পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চান। আর তিনিই ভাল জানেন কারা হিদায়াতের পথে আসবে।" (সূরা আল কাসাস ৫৬)

উপরোধৃত কুরআনী আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, জ্ঞান এবং কুদরতের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অধিকারভুক্ত। এই অধিকারত্বে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ কেউ বসান কোন ক্রমেই জায়িয নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা

হাসান (রাযি.) তো অনেক দূরের কথা। রসূল ﷺ সম্বন্ধে আমাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছে তা হচ্ছে তার এতা'আৎ! অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞা মেনে চলতে হবে। তাঁকে মেনে চললে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই মানা হবে। এ কথা আল্লাহ জাল্লাজালাল স্বয়ং বলে দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঃ

﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর আজ্ঞা মেনে চলল, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর আজ্ঞা মেনে চলল।" (সূরা আন-নিসা ৮০)

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران ٣٠)

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ করে চল ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।" (সূরা আলু ইমরান ৩০)

আমাদেরকে কুরআন মাজীদে এই হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন রসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর ব্রত পালনে সর্বতোভাবে সহায়তা করি, তাঁর শক্তি বর্ধিত করি এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করি। এ ছাড়াও তাঁর প্রতি রয়েছে আমাদের আরও বহু কর্তব্য যার বিস্তৃত বিবরণ কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাতে নাববীতে বিধৃত রয়েছে। সর্বোপরি তাঁকে ভালবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। সে ভালবাসা হবে সব ভালাবাসার উর্ধ্বে। ভাই-বোন, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালবাসতে হবে। তিনিই যে আমাদের প্রকৃত হিতকারী। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (الحزاب : ٦)

"তাদের নিজেদের চাইতেও নাবী ﷺ মুমিনদের প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল।" (সূরা আহযাব ৬)

﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (توبه : ٢٤)

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতৃবর্গ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্রগোষ্ঠী এবং তোমাদের সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দাপড়ার আশঙ্কা করে থাক এবং তোমাদের বাসগৃহ সমূহ যাতে (বাস করে) তোমরা সন্তোষপ্রাপ্ত, (এ সব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র চাইতে, আর রসূলের চাইতে এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্‌র ফরমান আসার সময় পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। (সূরা তওবাহ ২৪)

আর হাদীসে এসেছে ঃ রসূল ﷺ বলেছেন,

والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين–

"সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি (রসূলুল্লাহ) তার নিকট তার পিতামাতা, তার সন্তান সন্ততি এবং অন্য (সব) লোক থেকে প্রিয়তর হই।"

'উমার (রাযি.) এ কথা শুনে আরয করলেন,

يارسول الله، لا نت احب الى من كل شيء الا من نفسى فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك عن نفسك قال فلا نت احب الى من نفسى قال الان يا عمر–

"হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নিকট (দুনিয়ার) সব বস্তু হতে অধিকতর প্রিয় কিন্তু আমার নিজের জীবন ছাড়া। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'উমার! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিজের জীবন অপেক্ষাও আমি তোমার নিকট অধিকতর প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি (কামিল) মুমিন হতে পারবে না। এ কথা শুনে 'উমার বললেন, তা হলে এখান নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়।"

রসূলুল্লাহ ﷺ 'উমারের এই কথা শুনে বললেন, এখন তুমি হে 'উমার! (পূর্ণ পরিণত) মুমিন।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الا يمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا يقذه ان يلقى فى النار–

যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে ঃ

১। সেই ব্যক্তি- যার নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এই দু'জন ছাড়া অন্য সব কিছু হতে অধিকতর প্রিয় হয়।

২। সেই ব্যক্তি- যে কোন লোককে যখন ভালবাসে, তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই তাকে ভালবাসে।

৩। সেই ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ কুফরের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ঈমানের আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য করেন, সে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যেতে ঠিক তেমনই খারাপ জানে যেরূপ আগুনে ঝাপ দেয়ার কাজকে খারাপ জানে।"

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজের সেই প্রাপ্য হকসমূহও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন- যে হক আর কারোরই প্রাপ্য নয়। তিনি অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর 'হক' সমূহও বিশদভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমি অন্যত্র অত্যন্ত বিশদভাবে এইসব 'হক' এর কথা আলোচনা করেছি। এখানে অতি সংক্ষেপে নমুনা স্বরূপ দু' একটি কথা বলছি ঃ

আল্লাহ্ বলছেন ঃ

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (نور : ٥٢)

"যে সব ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হয় আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূল ﷺ এর এবং (সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ্‌কে) ভয় করে এবং তাঁকে সমীহ করে অন্যায় কার্য হতে আত্মরক্ষা করে চলে, সাফল্য অর্জন করে থাকে তারাই।" (সূরা আন-নূর ৫২)

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে- হুকুম মেনে চলতে হবে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলের- কিন্তু ভয় ও সমীহ করার পাত্র হচ্ছেন একমাত্র একজন এবং তিনি হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ। বান্দার ভয় ও সমীহ করার পাত্র হচ্ছেন একমাত্র তিনিই।

শরীয়তের বিধান দাতা হচ্ছেন আল্লাহ এবং রসূল উভয়েই কিন্তু বান্দার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ-কর্তা একমাত্র আল্লাহ আর তিনি একমাত্র তিনিই এই ব্যাপারে যথেষ্ট। কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে ঃ

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ﴾

"বস্তুতঃ (কতই না সুন্দর ও শুভ হতো তাদের পক্ষে) যদি তারা সন্তুষ্ট থাকত সেই বস্তু পেয়ে যা তাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এবং যদি তারা বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাঁর রহমাতের ভাণ্ডার থেকে আরও দিবেন এবং তাঁর রসূলও-আর আমরা প্রত্যাশা করে থাকব একমাত্র আল্লাহরই দিকে-যাচ্ঞা করে চলব একমাত্র তাঁরই নিকট।" (সূরা আত্-তাওবাহ ৫৯)

কাজেই দেখা যাচ্ছে ইতা'আত অর্থাৎ হুকুম পালন করতে হবে, আজ্ঞাবহ হতে হবে আল্লাহ্‌র এবং রসূল ﷺ উভয়ের, কিন্তু ভয় ও সমীহ করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে, তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে।

অতএব বুঝা যাচ্ছে দান-প্রদান (আদেশ-নিষেধ প্রভৃতি) আল্লাহ এবং রসূল ﷺ উভয়েরই শান। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পেশ ও প্রার্থনা জ্ঞাপন একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই সিদ্ধ এবং তাঁরই জন্য সুনির্দিষ্ট।

যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

﴿وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

আর রসূল ﷺ তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর (যা করতে আদেশ করেন তা পালন কর) এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন তার থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৭)

কেননা হালাল (সিদ্ধ কাজ) হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ হালাল করেছেন আর হারাম হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ হারাম করেছেন। (সুতরাং শরী'আতের বিধান প্রদানে আল্লাহ্‌র পরই রসূলুল্লাহ ﷺ এর ভূমিকা) কিন্তু নির্ভরশীলতা প্রশ্নে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপর কাউকেই সংযুক্ত করা চলবে না- তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ﷺ কেও নয়।

তাই নাবী-রসূল ও মুমিন-মুসলিমের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ.

"তারা বলেন, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

এ কথা বলা হয়নি ঃ

حسبنا الله ورسوله.

"আমাদের জন্য আল্লাহ এবং (তার সঙ্গে) তার রসূল যথেষ্ট।"

কুরআন মাজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (انفال : ٦٤)

"হে নাবী! আপনার জন্য এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার তাবেদারী করে চলে তাদের সকলের জন্য (সর্ব ব্যাপারে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

(সূরা আনফাল ৬৪)

এই আয়াতের এই অর্থই নিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ এবং অখণ্ডনীয়, অন্য অর্থ ভুল ও বিভ্রান্তিকর।

এই কারণেই তাওহীদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ('আ.) এবং তাওহীদের রূপকার মুহাম্মাদ ﷺ এর পবিত্র যবানে সদা উচ্চারিত কালেমা ছিল-

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ-

"আমাদের জন্য (সর্ব বিষয়ে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম নির্ভরস্থল হচ্ছেন তিনি।"

والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم – وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

সমাপ্ত

Misconception About Islam